কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড



ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ◆ পাঁপড়

AUTHENTIC INDIAN SPICES

207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007 Email: dutaspice@gmail.com Website: www.dutaspices.com

www.facebook.com/duta.rannaghar www.youtube.com/c/duta rannagharbengalirecipe

+91 98366 72200 | 033 2259 4112 | +91 98363 74300

পৌরাণিক উপন্যাস

মহাবীর শ্রীহনুমান

গোপাল চক্রবর্তী

বীর হনুমান, ভক্ত হনুমান, কর্তব্যে সদা অবিচল হনুমান। তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মলীলা যেমন বিচিত্র, তেমন বিচিত্র তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত। অপ্সরা পুঞ্জকস্থলী ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে ভূতলে বানরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বানররাজ কুঞ্জর তার পিতা। পুঞ্জকস্থলী হলেন কুঞ্জরের অসামান্যা রূপবতী কন্যা অঞ্জনা। সুমেরু পর্বতের বানরাধিপতি কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার বিবাহ হয়। বানর দম্পতির সুখের সংসার। একদিন অঞ্জনা আভরণে সুশোভিত হয়ে সুমেরু পর্বতে ভ্রমণ করছিলেন। এই সময়ে তিনি হঠাৎ পবন দেবের দৃষ্টিগোচর হলেন। দর্শন মাত্র পবনদেব তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন। অঞ্জনার রূপে বিমোহিত পবনদেব তাঁর সামনে প্রকট হয়ে তাঁকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। পবনদেবের এই আচরণে সতী-সাধ্বী অঞ্জনা রুষ্ট হয়ে পবনদেবকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। পবনদেব অঞ্জনাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

—হে বরাননে! তুমি শান্ত হও, ভয় পেয়ো না। আমার দ্বারা তোমার কোনো অহিত হবে না। আমি মনে মনে তোমাতে সংগত হয়েছি। তারফলে তুমি এক মহাতেজী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাপরাক্রমশালী, আমারই সমান বেগবান সুপুত্র লাভ করবে। পবনদেব অঞ্জনার সতীত্ব নষ্ট না করে শুধুমাত্র স্পর্শ করেই এক মহাবলশালী পুত্রের আশীর্বাদ দিলেন। শুভলগ্ন সমাগত হলে পর্বতগুহা আলোকিত করে মাতা অঞ্জনার কোলে এলেন রুদ্রাবতার হনুমান। রামায়ণ ও সমগ্র পুরাণ সাহিত্যে এই নবজাতক পবন নন্দন, হনুমান, মরুতাত্মজ নামে ভূষিত হয়েছেন। জনক বায়ুর মতো হনুমানও 'যথাবশংচরতি' অর্থাৎ স্বেচ্ছা বিহারী। পবননন্দন হলেও হনুমান বানররাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ সন্তান।

শিবপুরাণে শিব স্বয়ং বলেছেন— লক্ষ্মণ শেষনাগের অংশাবতার, শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণাবতার এবং হনুমান রুদ্রাবতার। স্কন্ধ পুরাণে শিবের স্বয়ং হনুমান রূপে আবির্ভাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে শিবের অংশরূপে হনুমানের আবির্ভাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও শিবের হনুমানরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।

দৈবীশক্তিতে জাত এই দেবশিশু শৈশবেই একদিন প্রভাতসূর্যকে উজ্জ্বল রঙের ফল মনে করে ধরবার জন্য আকাশে উড্ডীন হয়েছিল। পবনদেব অপত্যস্নেহে শিশুটিকে সূর্যের প্রখর তেজ থেকে রক্ষা করার জন্য হিমশীতল ছায়া প্রদান করছিলেন। সহস্র যোজন আকাশ অতিক্রম করার পর শিশুটি সূর্যের অতি নিকটে উপস্থিত হলে রাহুকে সূর্যের খুব কাছে দেখে শিশু হনুমান রাহুকে আক্রমণ করে বসল। এই বীর বালকের কাণ্ড দেখে ইন্দ্র রাহুকে সাহায্য করার জন্য ঐরাবতকে প্রেরণ করেন। বিচিত্র ঐরাবতকে দেখে বানর বালক রাহুকে ছেড়ে ঐরাবতের দিকে ধেয়ে গেল। বানর শিশুর উৎপীড়ন থেকে ঐরাবতকে বাঁচাবার জন্য ইন্দ্র মৃদু বজ্রপ্রহারে বানর শিশুটিকে সরিয়ে দেন। বজ্রাহত হয়ে শিশুটি এক পর্বতে পতিত হয়। পাথরের আঘাতে তার হনু (চোয়াল) ভেঙে যায়। পুত্রের প্রতি ইন্দ্রদেবের এহেন আচরণে পবনদেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। পবনদেবের ক্রোধ প্রশমন এবং শিশুটির শ্রুশ্রূষা করার জন্য অকুস্থলে পিতামহ ব্রহ্মা আগমন করেন। ব্রহ্মার করস্পর্শে বানরশিশু দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্রমে ওই স্থানে অনেক দেবতার আগমন ঘটে। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন— ''আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা এই শিশুর হনুভঙ্গ হয়েছে। আমার বরে এই বানর ভবিষ্যতে হনুমান নামে খ্যাত হবে এবং অসাধারণ কীর্তিমান হবে।"

''মৎকরোৎসৃষ্ট বজ্রেন হনুরক্ষ যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলোভবিতা হনুমানিতি।।"

সূর্য বরদিলেন—''আমার তেজের শতভাগের এক ভাগ একে দিলাম। যথা সময়ে আমি একে শাস্ত্রজ্ঞান দেব, তার প্রভাবে এই শিশু পরবর্তীকালে মহান বাগ্মী হবে।"

বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দেবতারাও হনুমানকে নানা রূপ বর দিলেন। ব্রহ্মাও হনুমানকে বর দিয়ে পবনদেবকে বললেন—''পবন! তোমার এই পুত্র দুষ্কৃতীদের শত্রু, সাধুজনদের অভয়প্রদ মিত্র হবে। অজেয় কালরূপী, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হবে।"

এইভাবে বিভিন্ন দেবতাদের বরপুষ্ট হনুমান অজেয় শস্ত্র অবধ্য হন। এইভাবে দেবতাদের বলে বলীয়ান বালক হনুমান পিতা কেশরী ও বায়ুর নিষেধ সত্ত্বেও ঋষিদের তপোবনে ও আশ্রমে নানা উপদ্রব করে বেড়াতে লাগল। তার উপদ্রবে অতিষ্ঠ মুনিগণ তাকে অভিসম্পাত দেন—''হে বানর, তুমি যে শক্তিতে মত্ত হয়ে আমাদের পীড়া দিচ্ছ, আমাদের অভিশাপে মোহিত হয়ে তুমি দীর্ঘকাল এই শক্তি বিস্মৃত হবে। কোনো মহাপুরুষ তোমার কীর্তির কথা স্মরণ করালে তোমার বলবীর্য পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।" সকল বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হনুমান অদ্বিতীয়। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেবের কাছ থেকে জানার উদ্দেশ্যে মহান গ্রন্থ ধারণ করে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সূর্যের পাশে পাশে গমন করেছিলেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রেও তার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। শুধু বিদ্যা নয় তপস্যায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বানররাজ কেশরী ও রানি অঞ্জনার চোখের মণি হনুমান। কপিরাজ কেশরীও মুনিদের আশীর্বাদে এই মহাবল পুত্র লাভ করেছেন। প্রভাসতীর্থে বহুমুনির আশ্রম। মুনিরা তীর্থের পুণ্য সলিলে স্নান করে সন্ধ্যা বন্দনা ও তপস্যা করেন। কিন্তু এক দুষ্ট হিংস্র মহাবল মাতঙ্গের উৎপাতে মুনিদের তপস্যা বারবার বিঘ্নিত হতো। একদিন এই দুষ্ট মাতঙ্গ ঋষিদের প্রধান ভরদ্বাজকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, দূরে দণ্ডায়মান বানররাজ কেশরী দ্রুত সেই মত্ত মাতঙ্গকে ধরে তার দুই বিশাল দন্ত উৎপাটিত করে সেই দন্তদ্বারা মাতঙ্গের উদর বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করে। এই তপস্যা বিঘ্নকারী দুষ্ট মাতঙ্গ নিহত হলে মুনিগণ সমস্বরে কপিরাজ কেশরীর জয়ধ্বনি দেন এবং তাঁকে প্রভাস তীর্থে স্বাগত জানান। ঋষি ভরদ্বাজ কেশরীকে ইপ্সিত বর প্রার্থনা করতে বলেন। কেশরী তখন এক মহাবল পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন। ভরদ্বাজের বরে কেশরী পবনদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত সন্তান মহাবীর হনুমানকে লাভ করেন।



বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে চোদ্দ বছরের বনবাস কালের শেষপর্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ-সহ পঞ্চবটি বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করছিলেন। সেই কুটির থেকেই রাক্ষসরাজ রাবণ ছলনা করে সীতাদেবীকে হরণ করে। রাম-লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বেরিয়েছেন। অনেক পথ অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছেছিলেন ঋষ্যমূক পর্বতের সানুদেশে। এই অঞ্চল বানররাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যসীমার মধ্যে। কিষ্কিন্ধ্যার রাজপরিবারে তখন চলছে এক ভয়ঙ্কর অন্তর্কলহ। এই বানররাজ্যের শাসক অমিত বিক্রম বালি। ভাই সুগ্রীবও অনুরূপ। দুই ভাইয়ের বিক্রমে ও সুশাসনে কিষ্কিন্ধ্যার সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। বালির পত্নী তারা, যুবরাজ অঙ্গদ, সুগ্রীবের পত্নী রুমা। এই দুইভাই অপরাজেয় হলেও মতাদর্শের দিক থেকে আলাদা। বালি বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগে প্রচলিত অনার্য সংস্কৃতির ধারক বাহক। সুগ্রীব আর্যাবর্তের আর্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দুই ভাইয়ের মিল ছিল এক জায়গায়, দুইভাই কিষ্কিন্ধ্যাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করত। বালি রাজা, রাজ্য রক্ষার ভার সুগ্রীবের উপর। সুগ্রীবের সহযোগী মহাবলী মিত্র হনুমান। মহাপ্রাজ্ঞ জাম্বমান বালীর মন্ত্রণাদাতা। রাজ্যের সর্বত্র সুখ-শান্তি বিরাজমান। হঠাৎ একদিন এক মহাশক্তিধর মায়াবী রাক্ষস কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করে উৎপাত শুরু করে। এই সংবাদ অবগত হয়ে বালি সুগ্রীব দুইভাই রাক্ষসের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হলো। প্রথমে বালি রাক্ষসকে আক্রমণ করে, বালির আক্রমণে পর্যুদস্ত রাক্ষস পশ্চাদপসরণ করে এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। বালি সুগ্রীবকে সুড়ঙ্গের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজে রাক্ষসকে অনুসরণ করে সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। দীর্ঘসময় কেটে যায়, বালি আর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে না। এক সময়ে গুহার ভিতরে রাক্ষসের ভয়ানক গর্জন এবং সুরঙ্গের মুখ দিয়ে রক্তধারা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সুগ্রীব ভাবল ওই রাক্ষসের হাতে নিশ্চয় বালি নিহত হয়েছে। আরও অনেক সময় অপেক্ষার পরও যখন বালি ফিরে এলো না তখন বালির মৃত্যু সম্বন্ধে সুগ্রীব নিশ্চিত হয়ে গেল। বালির মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেও সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে রয়েছে, সে যেকোনো সময় বেরিয়ে এসে রাজ্যে উৎপাত করতে পারে। এরূপ বিবেচনা করে এক বিশাল প্রস্তর খণ্ড দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে কিষ্কিন্ধার রাজপ্রসাদে ফিরে গেল এবং বালির নিহত হওয়ার ঘটনা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করল। বালির পারলৌকিক শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার শূন্য সিংহাসনে রাজা হয়ে বসল এবং বালির পত্নী তারাকে পুনরায় বিবাহ করল। হনুমান ও জাম্বমান তার সহায়ক হয়। হঠাৎ একদিন বালি ফিরে আসে কিষ্কিন্ধায় এবং এই সব ঘটানয় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে আক্রমণ করে। আসলে সেই সুড়ঙ্গে বালি রাক্ষসের হাতে নিহত হয়নি, সেই রাক্ষসই নিহত হয়েছিল, তার আর্তচিৎকার সুগ্রীব শুনেছিল। যে রক্তধারা সুরঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তা রাক্ষসের রক্ত। সুগ্রীব সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল তাই বালি রাক্ষস বধ করার পর সহজে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবার ক্রোধান্ধ বালির ভীম আক্রমণের সামনে সুগ্রীব দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করল। বালিও তার পশ্চাৎধাবন করে, সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নেয় কারণ মতঙ্গ মুনির অভিশাপে বালি এই পর্বতে আসতে পারবে না। জাম্বামান ও হনুমান সুগ্রীবের অনুগামী হয়। সুগ্রীবের অনুগত বানর সেনারাও ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের আশ্রয়ে চলে আসে। নিরাপদ আশ্রয়ে আছে ঠিকই কিন্তু বালির ভয় সর্বদা সুগ্রীবকে গ্রাস করে আছে।

এই সময়ে অযোধ্যার নির্বাসিত রাজকুমার শ্রীরাম চন্দ্র পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে পঞ্চবটী পর্বতে কুটির নির্মাণ করে বাস করছিলেন। ভগ্নী শূর্পনখার প্ররোচনায় রাক্ষসরাজ রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে। সীতার অন্বেষণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাম-লক্ষ্মণ একসময়ে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করে, উদ্দেশ্য বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তার সাহায্য নিয়ে রাবণের লঙ্কা রাজ্য আক্রমণ করে সীতা উদ্ধার। ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা একদিন ঋষ্যমূক পর্বতের সানুদেশে পৌঁছে গেলেন। পর্বতের শিখরদেশ থেকে অনুচর বেষ্টিত সুগ্রীব শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠল। অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলল—"মিত্রগণ, পর্বতের সানুদেশে চেয়ে দেখ, তপস্বীর বেশে অস্ত্রধারী দুই যুবাপুরুষ এগিয়ে আসছে। ওরা হয়তো বালির প্রেরিত কোনো যোদ্ধা, আমাকে বধ করতে আসছে।"

সুগ্রীব ভয় পেয়েছে দেখে হনুমান এগিয়ে এসে বলল—

—তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? মতঙ্গমুনির অভিশাপে এই ঋষ্যমূক পর্বতে বালি কখনো আসতে পারবে না। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ।

সুগ্রীবের ভয় কিছুতেই কাটছে না, হনুমানকে বলল—

—বালি তো তার কোনো অনুচরকেও তো পাঠাতে পারে। তুমি বরং ছদ্মবেশে গিয়ে ওই আগন্তুকদের পরিচয় জেনে এসো। ওদের কথাবার্তা হাবভাব ভালো করে লক্ষ্য করবে।

হনুমান তখন সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল—

—হে অপরিচিত অতিথি! আপনাদের দেবতা বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের অঙ্গে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ পাচ্ছে। আকৃতি

রাজার মতো হলেও আপনাদের বেশভুষা সন্ন্যাসীর ন্যায়। আপনারা কি ব্রহ্মচারী? এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছেন কেন? আপনাদের দৃষ্টি ও গতি সিংহের ন্যায় কিন্তু নিঃশ্বাসে যেন শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আপনারা যোদ্ধার ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আপনাদের দেখে অরণ্যের প্রাণীরা ভয় পাচ্ছে। আপনারা দেবতা না মানুষ তা বোঝা যাচ্ছে না, আপনাদের আগমনের কারণও আমাদের কাছে অজানা। বানরদের রাজা সুগ্রীব এই পর্বতে বাস করেন, তিনি ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বড়ো দুঃখে এই অরণ্যে বিচরণ করছেন। আমি কেশরীপুত্র হনুমান, সুগ্রীবের আদেশে আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

হনুমানের এহেন বিনীত বচনে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। লক্ষ্মণকে বললেন—

—যে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে আমরা মিত্রতা স্থাপন করতে চাই ইনি তারই মন্ত্রী। এঁর বাক্য শুনে মনে হয়, ইনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বরাক্ষর নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বাক্‌পটু। ইনি নিশ্চয় বিশেষভাবে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছেন। কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। নির্ভুল সুললিত উচ্চারণ। সুমিষ্ট কণ্ঠ। মিতভাষী। এঁর বাক্য দ্রুত নয়, আবার বিলম্বিতও নয়। শান্ত মধ্যমস্বরে কথা বলেন। কথা বলার সময় চোখে মুখে ললাটে ও অবয়বে কোনো বিকার দেখলাম না। এঁর কথা শুনলে মনে আনন্দ হয়। লক্ষ্মণ তুমি এঁর সঙ্গে কথা বল।

তখন লক্ষ্মণ এগিয়ে গিয়ে বললেন—হে ভদ্র! আমরা অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র। পুণ্যে-দানে-বীরত্বে-যশে যিনি কীর্তিমান ইনি আমার অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র, আর আমি তাঁর সেবক অনুজ লক্ষণ। ইতিপূর্বে আমরা বানররাজ সুগ্রীবের গুণাবলী শ্রুত হয়েছি। এখন আমরা তারই অন্বেষণ করছি। সম্পদে বিপদে যিনি সকল প্রাণীর আশ্রয়, সেই রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থী।

হনুমান বললেন—

এ সুগ্রীবের পরম সৌভাগ্য। বালি তাঁকে রাজ্য থেকে বিতারিত করেছে, তাঁর পত্নীকেও হরণ করেছে। বর্তমানে তিনি দুঃখিত, ভীত ও অসহায়। আপনাদের মতো বলবান সহায় হলে তাঁর মঙ্গল হবে।

সবকথা শুনে লক্ষণ শ্রীরামকে বললেন—

হনুমানের কথায় মনে হচ্ছে, আমাদের এখানে আসার ফলে

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

আমাদের ও সুগ্রীবের উভয় পক্ষেরই হিত হবে।

হনুমানের কথা এবং তাঁর মুখের প্রসন্নভাব দেখে মনে হচ্ছে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন না।

হনুমান তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেল। হনুমানের উদ্যোগে অগ্নিসাক্ষী করে, মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপন করলেন। এই মিলনে সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত ও আশ্বস্ত হলো। বলল—

হে আর্য! আপনাকে মিত্ররূপে পেলাম। এবার দেবতারা নিশ্চয় আমাকে কৃপা করবেন। আমি আপন রাজ্য থেকে বিনাদোষে বিতাড়িত। আমার পত্নীও অপহৃতা। আমি সহোদর বালির ভয়ে ভীত। আমাকে অভয় দান করুন।

শ্রীরাম তখন স্মিতহাস্যে সুগ্রীবের হস্তধারণ করে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং অভয় দিলেন। তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে তাঁকে পুনরায় সিংহাসনে বসাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অপহৃতা পত্নীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের আশ্বাসও দিলেন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে কিষ্কিন্ধ্যার রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেললেন। আর্যাবর্ত থেকে অনেক দূরে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য। আর্যাবর্তের সঙ্গে তার ভাষা সংস্কৃতির কোনো কিছুরই মিল নেই। তবুও তারা আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। তারা সংস্কৃত শিক্ষা করে। বেদ অধ্যয়ন ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে। বালি অনার্য সভ্যতার ধারক হলেও অনার্য সভ্যতার মুখপাত্র রাবণের সঙ্গে তার বিরোধ। সুগ্রীব, হনুমান আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের আগ্রহে সেই ঋষ্যমূক পর্বতেই সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হলো বৈদিক শাস্ত্র বিধি অনুসারে, পুরোহিতের মন্ত্রে, পবিত্র বারি সিঞ্চনে।

সুগ্রীব এবার এমন এক কাহিনি শ্রীরামকে শোনালেন যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন। সুগ্রীব-সহ পঞ্চবানর একদিন ঋষ্যমূক পর্বতের শীর্ষদেশে আলাপচারিতায় রত। এমন সময় আকাশ পথে রাক্ষসরাজ রাবণের বিমান উড়ে যাচ্ছিল। আর সেই বিমানে ক্রন্দনরতা এক কন্যাকে দেখা গেল। এই পঞ্চ বানরকে দেখে সেই ক্রন্দসী তার উত্তরীয় ও ভূষণ ছুড়ে ফেলছিল। সুগ্রীব বলল—হে রঘুনাথ! আমি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আপনি আদেশ করলে সেই সব সামগ্রী আপনার সমক্ষে নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীরাম সম্মতি জানালে সুগ্রীব সেই রক্ষিত দ্রব্যসমূহ রামের সামনে এনে রাখল। সীতার উত্তরীয় ও ভূষণসমূহ দেখে শ্রীরাম চিনতে পারলেন এবং রোদন করতে লাগলেন। এবার সবাই নিশ্চিত হলেন রাক্ষসরাজ রাবণই সীতাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু সীতাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা জানা দরকার। এরমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রেরও একটা বিশেষ কাজ রয়ে গেছে। প্রতিজ্ঞামতো সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা।

'ঋষ্যমূক থেকে শ্রীরাম সুগ্রীবকে পাঠালেন বালির মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। শ্রীরামের আশ্বাসে সুগ্রীব বীরদর্পে বালির সম্মুখীন হলো। সুগ্রীবকে দেখে বালির ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল। বীরবিক্রমে বালি আক্রমণ করল সুগ্রীবকে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা সুগ্রীবের ছিল না। এই অবস্থায় শ্রীরামও সুগ্রীবকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। যদিও শ্রীরাম লক্ষণ সশস্ত্র হয়ে বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো বালি ও সুগ্রীব দেখতে প্রায় একই রকম। দূর থেকে চেনা দায় কে বালি আর কে সুগ্রীব? শ্রীরামের ভয় বালিকে মারতে গিয়ে যদি সেই তীর সুগ্রীবকে আঘাত করে। এদিকে বালী পুনঃপুনঃ আঘাতে রক্তাক্ত সুগ্রীব কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে ফিরে গেল। শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান ও সুগ্রীবের হিতৈষী অন্যান্য বানর বীররাও ফিরে গেল ঋষ্যমূক পর্বতে। যন্ত্রণায়, হতাশায়, অপমানে অধোমুখ সুগ্রীব। অন্যান্য বানর বীররাও নীরব। প্রথম কথা বললেন শ্রীরামচন্দ্র।

—মিত্র নিরাশ হয়ো না। ভরসা রাখো। তোমরা দুই ভাইয়ের আকৃতি একইরকম। আমি দূর থেকে বুঝতে পারিনি কে বালি কে সুগ্রীব। কাল তুমি আবার বালির মুখোমুখি হবে এবং শরীরের কোনো একটি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করবে। আমি যেন দূর থেকে দেখে নিশ্চিত হতে পারি কে বালি, কে সুগ্রীব। আগামীকাল বালির মৃত্যু অনিবার্য।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ বন থেকে অনেক ফুল তুলে আনলেন। নিজ হাতে মালা গাঁথলেন এবং মালা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে তাঁকে বালির কাছে পাঠালেন। অঙ্গনে সুগ্রীবকে দেখে বালি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো এবং তৎক্ষণাৎ এসে সুগ্রীবকে আক্রমণ করল, ভর্ৎসনা করল—

—নির্লজ্জ পামর। কাল দয়াপরবশ হয়ে তোকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে ছিলাম। তুই আজ আবার এসেছিস আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবি বলে। তোর যুদ্ধের সাধ আমি এখনই মিটাচ্ছি।

দুই বীরের মধ্যে তখন ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ তখন বৃক্ষের অন্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন। বালি ও সুগ্রীব কেউ কারও থেকে কম যায় না। সুগ্রীবের গলায় মালা থাকাতে আজ তাঁকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। দুই যোদ্ধার প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র কিস্কিন্ধ্যা থরহরি কম্পবান। পশুপাখিরা দূরে পালাচ্ছে। এক সময়ে বালি সুগ্রীবকে কাবু করে ফেলে আর ঠিক সেই সময়ে অন্তরাল থেকে শ্রীরাম বালিকে লক্ষ্য করে ঐষিকবাণ নিক্ষেপ করেন। দশদিক আলোকিত করে সেই বাণ বালির বুকে বিদ্ধ হলো। আর্তনাদ করে বালি ভূমিতে পতিত হলো। শ্রীরাম তখন অন্তরাল থেকে ধীর গতিতে বালির দিকে

এগিয়ে আসছে। সুগ্রীবের চোখে কৃতজ্ঞতা আর শ্রীরামকে দেখে বালির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। বালির বিদুষী স্ত্রী তারা অযোধ্যার রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কিস্কিন্ধ্যায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে বালিকে সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বালি তারার কথা অমান্য করে সুগ্রীবের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিরবিদ্ধ হবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে অকুস্থলে দেখে সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ষড়যন্ত্রের কথা বালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বালি বলল—

রামচন্দ্র। শুনেছি অযোধ্যার বিখ্যাত সূর্যবংশে তোমার জন্ম দশরথের পুত্র তুমি! কিন্তু এহেন হীনকাজ তুমি কেন করলে? আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ, মাঝখানে তুমি কেন এসে আমাকে আঘাত করলে? যদি বানরের দ্বারা তোমার কার্যোদ্ধার হবে, তবে আমাকে সেই দায়িত্ব দিলে না কেন? একদিনে সীতাকে উদ্ধার করে রাবণকে তোমার চরণে এনে ফেলতাম। রাবণ আমার সঙ্গে একবার লড়তে এসেছিল। লেজে বেঁধে তাকে চার সমুদ্রে ডুবিয়েছি, অবশেষে পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে পরিত্রাণ পায়।

শ্রীরামের বাণে বালির পতন হয়েছে এই সংবাদ শুনে অন্তপুর থেকে পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে তারাদেবী বালির কাছে ছুটে আসে। বালির অনুচররা তখন সবাই পালিয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ ছেড়ে আহত বালির পাশে বসে আছেন। পাশে ভাই লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব। তারাদেবী সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকে বলেন—

শ্রীরাম তোমাকে নাকি সবাই দয়াবান বলে? তবে তুমি আমার পতিকে কেন ছলনা করে হত্যা করলে? আমার সর্বনাশ করে তুমি সুগ্রীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করলে। হে রামচন্দ্র, বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতো তুমি অবগত আছ। তবে সেই যন্ত্রণা তুমি কেন আমাকে দিলে? আমার স্বামী তোমাকে অভিশাপ দেননি কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তা নিশ্চয়ই ফলবে। আপন বিক্রমে আর বানরসেনার সহায়তায় তুমি সীতাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু সীতাকে তুমি কাছে রাখতে পারবে না। আমাকে তুমি যেমন কাঁদিয়েছ তেমনি সীতাদেবীও তোমাকে কাঁদিয়ে অন্তর্ধান করবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

তোমার অভিশাপ আমি মস্তকে ধারণ করলাম। বালির এটি নিয়তি, আমি নিমিত্ত মাত্র।

বালির তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বালির পাশে বসলেন, বিনীতভাবে বললেন—

হে বীরশ্রেষ্ঠ আমায় ক্ষমা কর। তোমার মৃত্যু দৈবের লিখন। তুমি ইন্দ্রপুত্র, মহেন্দ্রের বেশ ধারণ করে তুমি অমরাবতীতে প্রস্থান করো।

বালির অন্তিম সময়ে তারাদেবী আবার রোদন শুরু করলেন। রামের প্রতি ক্রোধ তিনি সম্বরণ করতে পারছেন না। তারাদেবী আবার শ্রীরামচন্দ্রকে অভিসম্পাত করলেন—

দশরথ নন্দন! বিনা দোষে তুমি কপীশ্বরকে মেরেছ। আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি জন্মান্তরে বালির হাতে তোমার মৃত্যু ঘটবে।

বালির মস্তক কোলে নিয়ে তারা অনবরত কেঁদে চলেছে। মুমূর্ষু বালি তখন ক্ষীণকণ্ঠে তারাকে বললেন—

শ্রীরামকে আমি অনেক কটুকথা বলেছি। আমি লজ্জিত। আমার মৃত্যু বিধির নির্বন্ধ। শ্রীরামকে দোষারোপ করো না।

এইকথা বলতে বলতে বালি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তারার আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলো। সুগ্রীব বালির বুক থেকে সেই বাণ তুলে নিল। বালির রক্তে মেদিনী সিক্ত হলো। হনুমান তারাদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—

রানি, তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর। শোক পরিহার কর। পরম ধার্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান। রামের প্রসাদে পিতৃস্থান অমরাবতীতে চলেছেন।

কিস্কিন্ধ্যার বানর সমাজ তখন পম্পানদীর তীরে চিতা তৈরি করে রাজকীয় সমারোহে বালির দাহকার্য সম্পন্ন করে। বালির অমাত্যরা যুবরাজ অঙ্গদকে রাজা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শোকে কাতর হয়েও তারাদেবী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তারাদেবী বলে—

অঙ্গদ যদি রাজা হয় তাহলে সুগ্রীব শ্রীরামের সাহায্য করবে কি করে? শ্রীরামের সাহায্যের জন্য সুগ্রীবের রাজা হওয়া প্রয়োজন।

অতঃপর তারাদেবীর ইচ্ছায় এবং বানর সমাজের উদ্যোগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে মহা সমারোহে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হলো। ঋষ্যমূক পর্বত ছেড়ে সুগ্রীব এল কিস্কিন্ধ্যার রাজ প্রাসাদে। পত্নী রুমা ফিরে এল সুগ্রীবের কাছে। বর্ষীয়ান আমত্যদের অনুরোধে আবার তারাদেবীকেও বিবাহ করল সুগ্রীব। শত অনুরোধেও শ্রীরাম লক্ষণ রাজপুরীতে থাকলেন না। কারণ তিনি চোদ্দ বৎসর বনবাস জীবন যাপন করবেন বলে পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিস্কিন্ধ্যা থেকে দুই ক্রোশ অন্তরে মাল্যবান পর্বতে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীরামের নির্দেশে সুগ্রীব তারার পরামর্শে রাজ্যশাসন করবেন বলে অঙ্গীকার করল। যুবরাজ রূপে অঙ্গদের অভিষেক হলো। বর্ষার আগমনে কিস্কিন্ধ্যার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, মুহুর্মুহু বজ্রপাত, প্রচণ্ড বর্ষণে নিম্নভূমি প্লাবিত। শ্রীরামচন্দ্র বর্ষার শেষ পর্যন্ত বানর সেনাদের আপন আপন গৃহে বাস করার পরামর্শ দিলেন। বর্ষাশেষে শুরু হবে লঙ্কা অভিযান, সীতা উদ্ধার। হনুমান কিস্কিন্ধ্যা নগরী, বিলাসবৈভব পরিত্যাগ করে মাল্যবান পর্বতে শ্রীরামের সঙ্গে কুটিরবাসী হলো। পরবর্তীকালে শ্রীরামের নির্দেশে সুগ্রীবের নিরাপত্তার জন্য হনুমান কিস্কিন্ধ্যায় ফিরে গেল।



ক্রমে বর্ষা বিদায় নিল। ভেকের নিনাদ আর মেঘের গর্জন শেষ। শরতের নির্মল আকাশে পূর্ণ চন্দ্রমার প্রকাশ। শ্রীরামের বিরহী চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। বর্ষার অবসানেও সুগ্রীবের কাছ থেকে কোনওরূপ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা হয়ে সুগ্রীব দুই স্ত্রীকে নিয়ে বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে আছে। অকৃতজ্ঞ সুগ্রীবের এহেন আচরণে শ্রীরামচন্দ্র নিরাশ ও ক্রুদ্ধ হলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য ধনুর্বাণ হাতে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে সশস্ত্র অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যার রাজপ্রসাদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত দেখে হনুমান প্রমাদ গুনল। যুবরাজ অঙ্গদকে বললেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে মহার্ঘ আসনে বসাতে। অঙ্গদকে সামনে দেখে লক্ষ্মণ বললেন—

বালীপুত্র অঙ্গদ! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমন সংবাদ দাও। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বানর সেনাদের বর্ষাবকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ষাবসানে শরৎ আগত, কিন্তু পাষণ্ড সুগ্রীব রাজ্যলাভ করে শ্রীরামের কার্যোদ্ধার করার কথা ভুলেই গেছে। ডাকো সেই অকৃতজ্ঞ সুগ্রীবকে আমি আজ তাকে সমুচিত দণ্ড দেবার জন্য এখানে এসেছি।

লক্ষ্মণের ক্রোধ দেখে ভীত হয়ে অন্তপুরে সুগ্রীবের কাছে চলে যায় অঙ্গদ। লক্ষ্মণের আগমন সংবাদ সুগ্রীবকে দিয়ে তার প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধের কথাও জানায়। লক্ষ্মণের আগমন এবং সুগ্রীবের প্রতি তার ক্রোধের কথা শুনে সুগ্রীব বলে—

—শ্রীরামের সঙ্গে মিত্রতা করেছি সত্য কিন্তু সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ হারাতে পারবো না। এখন লক্ষ্মণকে ফিরে যেতে বলো। যা করার পরে করব।

তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী হনুমান তথায় উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে হিতোপদেশ দিয়ে বলে—

—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু। তাঁর প্রতি তোমার এহেন আচরণ মোটেই শোভনীয় নয়। যাঁর কৃপায় তুমি রাজ্য পেলে, সম্মান পেলে, হৃতপত্নীকে ফিরে পেলে তাঁর প্রতি তোমার এই বাক্য ও আচরণ অনুচিত। তাছাড়া মাতা সীতার উদ্ধারকল্পে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করতে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন সবকিছু ফিরে পেয়ে তুমি সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছ। নিজে পত্নীর সঙ্গে দিবারাত্র বিহার করছ। শ্রীরামের বিরহের কথা তার অসহায়ত্বের কথা তুমি বিস্মৃত হয়েছ। এই দুর্দিনে শ্রীরামের পাশে একবারের জন্য দাঁড়িয়ে একটি সান্ত্বনাবাক্যও তুমি তাঁকে বলোনি। আজ লক্ষ্মণ তোমার দ্বারে এসে ক্রোধ প্রকাশ করছে বলে তুমি বিরূপ মন্তব্য করছ। রাবণের ভয়ে তুমি ভীত কিন্তু দাশরথি শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হলে তোমার সবংশে বিনাশ হবে। অগ্নিসাক্ষী করে তুমি শ্রীরামকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বাণে চোদ্দ হাজার রাক্ষসের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা কুপিত হলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব কালবিলম্ব না করে শ্রীরামের শরণ নিয়ে তাঁর কার্যে প্রবৃত্ত হও।

হনুমানের হিতবাক্যে সুগ্রীবের বোধোদয় হলো। লক্ষ্মণকে আপ্যায়ন করে পুরীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য অঙ্গদকে নির্দেশ দিল। অঙ্গদের মাধ্যমে সুগ্রীবের আহ্বানে লক্ষ্মণ পুরীতে প্রবেশ করেন। তখনও লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। সুগ্রীবকে সম্মুখে পেয়ে লক্ষ্মণ বললেন—

—দুরাচারী সুগ্রীব, পৃথিবীতে এমন কাজ কে করেছে যে আগে ভরসা দিয়ে কার্যোদ্ধার করে পরে দূরে লুকিয়ে থাকে? তোমার জন্মান্তরের পুণ্যে শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে মিত্র বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, বালিকে মেরে তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বর করলেন। শ্রীরামের কৃপায় তুমি স্ত্রীকে ফিরে পেলে। অথচ একবারও খোঁজ নাওনা যে আমরা দুই ভাই কোথায় আছি, কেমন আছি। তোমার মতো বিশ্বাসহন্তাকে শমনভবনে পাঠান উচিত।

লক্ষ্মণের ক্রোধ দেখে তারা, রুমা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সুগ্রীব অঙ্গীকার করল যত দ্রুত সম্ভব সে বানর সৈন্যদের একত্রিত করে শ্রীরামচন্দ্রের কাজ শুরু করবে। বানরসেনা সমাবেশ করার জন্য হনুমানকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। মিত্র শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য লক্ষ্মণের সঙ্গে সমুদ্রতীরে গমন করল। এদিকে হনুমানের চেষ্টায় কয়েক দিনের মধ্যে বিশাল বানর সেনার সমাবেশ হলো। সীতার অন্বেষণে দিকে দিকে বানর সেনাদের পাঠানো হলো। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো দিক বাদ গেল না। কিন্তু সবদিক থেকে বানরসেনারা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এল। কোথাও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না।

সমস্ত বানরসেনা আবার মিলিত হলো সাগর তীরে। সঙ্গে জাম্ববান, অঙ্গদ, নল, নীল প্রমুখ। সবাই চিন্তিত সীতার খোঁজ না পেলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে সমস্ত বানর সমাজকে ধ্বংস করবে। বানররা যখন কথোপকথনে রত তখন এক বানরের নজরে এল পর্বতের শৃঙ্গোপরি এক অদ্ভুত প্রাণী। দেখতে এক বিশাল পক্ষীর মতো কিন্তু দেহ পালকহীন। প্রবীণ বানরেরা বলল এ নিশ্চয় কোনো মায়াবী রাক্ষস আমাদের ভক্ষণ করতে এসেছে, আমাদের কালবিলম্ব না করে এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। অঙ্গদ বলল—

—আমাদের এখন চারদিকেই বিপদ। সীতার সন্ধান না

পেলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আমাদের শত্রু হবে। আবার সীতার সন্ধান করতে গিয়ে রাবণের সঙ্গে আমাদের সংঘাত অনিবার্য। সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে জটায়ুকে রাবণের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। জটায়ু গরুড়ের সন্তান মহাশক্তিধর।

গরুড়ের নাম শুনে পর্বতশৃঙ্গে প্রাণীটি যেন নড়েচড়ে বসলো। সেখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলল—

—হে কপীগণ! তোমাদের আলোচনায় জটায়ূর নিধন সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। জটায়ু আমার ভ্রাতা, আমি সম্পাতি, আমরা গরুড়ের সন্তান। বিধির বিপাকে আমার পাখা পুড়ে গেছে, তোমাদের কাছে উড়ে যাওয়ার শক্তি আমার নেই, যদি আমার কাছে এসে জটায়ূর বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর তবে কৃতার্থ হবো।

সেই প্রাজ্ঞ বানর বলল,এ হচ্ছে ওই মায়াবীর ছলনা। আমরা ওর কাছে গেলে গিলে খাবে।

হনুমান বলল, তোমরা ভয় পেয়ো না আমি ওই মায়াবীর কাছে যাচ্ছি। যদি সত্যি কোনো ভয়ের কারণ না থাকে তবে ওকে এখানে নিয়ে আসব।

হনুমান অতি দ্রুত সেই বিকট মূর্তির কাছে গেল। সত্যি সেই অতি বৃদ্ধ বিহঙ্গের দেহের পালকের একটিও অবশিষ্ট নেই। চোখ দুটিও ঘোলাটে। হনুমানকে দেখে বিহঙ্গ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমাকে আমার সহোদর জটায়ূর বৃত্তান্ত বলো। জটায়ূর সঙ্গে আমার বহুকাল সাক্ষাৎ হয়নি। আমরা দুই ভাই একদিন এক প্রতিযোগিতা করলাম যে আগে সূর্যকে ছুঁয়ে আসতে পারবে সে বড়ো বীর। যৌবনের চাপল্যবশত একদিন সকালে উদীয়মান সূর্যকে লক্ষ্য করে দুই ভাই উড়তে শুরু করলাম। দীর্ঘ সময় ওড়ার পর আমরা মধ্যাহ্ন সূর্যের কাছাকাছি এসে গেছি, সূর্যের তীব্র দহনে দুই ভাই দগ্ধ হচ্ছি অসহ্য সেই দহন আমি আমার পাখা বিস্তার করে জটায়ূকে সূর্যের দহন থেকে রক্ষা করলাম আর তাতে আমার সব পালক পুড়ে গেল, আমি এই পর্বতে পতিত হলাম। সাতদিন অনাহারে থাকার পর এক মহাত্মা এসে আহার্য ও পানীয় দান করে আমার জীবন রক্ষা করেন। হিমালয়ে আমার পরিবার ও পুত্র সুপার্শ্ব থাকে, তাদের কাছে সেই মহাত্মা আমার অবস্থা জানিয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। সুপার্শ্ব প্রতিদিন আমার আহার দিয়ে যায়। সেই মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন ত্রেতাযুগে অযোধ্যা নৃপতি দশরথের পুত্ররূপে স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হবেন তাঁর নাম হবে শ্রীরাম। তিনি স্বয়ং বনবাস গ্রহণ করে এই পার্বত্য প্রদেশে আসবেন। তাঁকে দর্শন করলে কিংবা কোনো ভক্তজনের মুখে শ্রীরামকথা শ্রবণ করলে আমার দেহে আবার নতুন পালক সৃষ্টি হবে। আমি এই জরা থেকে মুক্তি পাব। তোমাকে দেখে ভক্তজন বলে বোধ হচ্ছে। তুমি কি শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে কিছু অবগত আছ? আমাকে তা শোনাতে পার?

—হ্যাঁ, আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি। তিনি তাঁর কার্য সাধনের জন্য আমাদের এখানে আগমন। হে পূজ্য বিহঙ্গ, শ্রবণ করুন দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য অনুজ লক্ষ্মণ এবং পত্নী সীতাদেবী-সহ চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে আসেন। পঞ্চবটী বনের কুটির থেকে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। সীতার অন্বেষণে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন ঋষ্যমূক পর্বতে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সুগ্রীব শ্রীরামকে সীতা উদ্ধারের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। আমি হনুমান এবং অন্যান্য বানরসেনারা এখন সীতাদেবীর অন্বেষণে বেরিয়েছি।

হনুমানের মুখে শ্রীরামকথা শুনতে শুনতে সম্পাতির দেহে নতুন পালক গজাতে শুরু করল। হনুমান তখন সম্পাতিকে কাঁধে তুলে বানর সেনাদের কাছে নিয়ে গেল। এই সময় অতিকায় বিহঙ্গ সম্পাতি জানাল দক্ষিণ দিকে মাথা তুললে সে লঙ্কার এক কাননে রাক্ষসী বেষ্টিত এক দেবীকে দেখতে পায় সম্ভবত ইনি সীতা দেবী। এই সময় সূর্যকে আচ্ছাদিত করে এক বিশাল ছায়াস্থানটিকে অন্ধকার করে দিল। বানরসেনারা তখন ভীত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। সম্পাতি তাদের অভয় দিয়ে বলল—

—তোমরা ভয় পেয়ো না। আমার পুত্র সুপার্শ্ব আমার আহার্য নিয়ে হিমালয় থেকে আসছে তার বিশাল পাখার ছায়া পড়ছে। এই সময়ে এক বিশাল বিহঙ্গ পক্ষ গুটিয়ে সম্পাতির সামনে এসে দাঁড়াল। বানররা তার বিশাল অবয়ব এবং ভয়ঙ্কর চঞ্চু দেখে সম্পাতির পেছনে আশ্রয় নিল।

বিস্মিত সুপার্শ্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করল। তার দেহে নতুন পালক হলো কীভাবে? উত্তরে সম্পাতি বলল।

—বহুকাল আগে এক মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন যে কোন ভক্তজনের মুখে শ্রীরামকথা শ্রবণ করলে আমার দেহে নতুন পালকের সৃষ্টি হবে। আজ আমি এই রামভক্ত হনুমানের কাছে রামকথা শ্রবণ করেছি। তাই আমার দেহে নতুন পালক গজাচ্ছে। সেই মহাত্মা আমাকে বলেছিলেন, বনবাসকালে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করবে দেবী সীতার অন্বেষণে শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণ এই পার্বত্যভূমিতে আসবেন। তিনি এসেছেন এবং হনুমান ও এই বানর-কটক শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে সীতার অন্বেষণে বেরিয়েছে।

সুপার্শ্ব হনুমানকে জিজ্ঞাসা করল—

—তোমরা কি শ্রীরামের পত্নী সীতাদেবীর সন্ধান পেয়েছ?

হনুমান জানাল না এখনো পাইনি।

সুপার্শ্ব বলল তবে শোন, আমি একদিন পিতার আহার্যদ্রব্য নিয়ে আসছিলাম। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এক রমণীকে জোর করে রথে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুদ্‌বর্ণা ওই রমণী শ্রীরাম, লক্ষ্মণ বলে আর্তনাদ করছিল, ওই নারীই সম্ভবত সীতা।



রাবণের সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই রমণীর দেহে কোন আঘাত ছিল না। আমি নিশ্চিত রাবণ সীতাকে সাগর পেরিয়ে লঙ্কাতেই নিয়ে গেছে। আমি রাবণকে সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারতাম তবে নারীবধের ভয়ে তা করিনি।

হনুমান বলল—

—হে সম্পাতি-পুত্র সুপার্শ্ব। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হে মান্য বিহঙ্গ সম্পাতি আপনাকে আর একটি সংবাদ দেওয়ার আছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে শুনেছি যখন পঞ্চবটীর কুটির থেকে রাবণ সীতামাতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এক মহান বিহঙ্গ সর্বশক্তি দিয়ে তার পথ রোধ করে। রাবণ অস্ত্রাঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে পালিয়ে যায়। সেই বিহঙ্গের রক্ত রাবণের দেহে লেগে থাকতে পারে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে এই দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য সেই বিহঙ্গ প্রাণধারণ করেছিল। অনেক বিলম্বে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তথায় এলে বিহঙ্গ সব বৃত্তান্ত জানিয়ে দেহ ত্যাগ করে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তার যথোপযুক্ত সৎকার করেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে শুনেছি সেই মহান বিহঙ্গের নাম জটায়ু।

বৃত্তান্ত শুনে সম্পাতি সহোদরের জন্য বিলাপ করতে লাগল। ততক্ষণে তার সর্বাঙ্গে নতুন পালক সৃষ্টি হয়েছে। সুপার্শ্ব তখন পিতাকে অনেক যত্নে শান্ত করে। সম্পাতি বলল—

—শ্রীরামচন্দ্রের কোনো সেবা করতে পারলে আমরা ধন্য হবো। যদি প্রয়োজন থাকে জানাবে।

সুপার্শ্ব বলল—

—যদি তোমরা লঙ্কায় যেতে চাও তবে আমি পিঠে চাপিয়ে তোমাদের লঙ্কায় পৌঁছে দিতে পারি।

হনুমান বলল—

—তার প্রয়োজন হবে না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় আমি এই কাজ অনায়াসে করতে পারব।

সম্পাতি তখন উড়তে সক্ষম। পিতা-পুত্র উড়ে গেল উত্তরে। আর হনুমান-সহ বানরেরা সীতার সংবাদ নিয়ে ফিরে গেল শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর সুগ্রীবের কাছে।



প্রায় দুই পক্ষ অতিক্রান্ত হতে চলল, সীতাদেবীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। আর হনুমান সহ বানর সেনারাও ফিরে এলো না। শ্রীরামের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সুগ্রীবও চিন্তান্বিত আর লক্ষ্মণ কিছুতেই ক্রোধ প্রশমিত করতে পারছেন না। এই সময় হনুমান, অঙ্গদ-সহ বানরসেনারা ফিরে এল। রাবণ যে সীতা দেবীকে লঙ্কায় নিয়ে গেছে এবিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ তারা নিয়ে এসেছে। আবার দক্ষিণসাগর তীরে শুরু হলো মহা সম্মেলন। কে নেই সেখানে? আছেন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, নল, নীল প্রমুখ। আছে লক্ষ লক্ষ বানরসেনা। সম্পাতি ও সুপার্শ্বের উল্লেখ করে হনুমান সীতার সম্ভাব্য লঙ্কায় অবস্থিতির কথা জানাল। বানরসেনা সমুদ্রের এই পারে সর্বত্র অনুসন্ধান করেছে কোথাও সীতাদেবীকে পাওয়া যায়নি। সম্পাতি পুত্র সুপার্শ্বের বর্ণনা অনুসারে রাবণ সীতাদেবীকে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন। অতিকায় সম্পাতিও লঙ্কার কোনো কাননে রাক্ষসী বেষ্টিত অবস্থায় এক দেবীকে দর্শন করেছে। ইনি সম্ভবত সীতামাতা।

প্রাজ্ঞ জাম্ববান বলল—এইবার সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় মাতা সীতার অন্বেষণ করতে হবে। বানর বীরদের মধ্যে কে কে সাগর লঙ্ঘনে সক্ষম?

জাম্ববানের প্রশ্নে সব বানরবীররা মাথা হেট করে। এবার অঙ্গদ বলল—

—মাতা সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করে অমর কীর্তি স্থাপনে কোন বীর আগ্রহী?

অঙ্গদের বচনে গয় নামে এক বানরবীর মাথা তুলে বলল—

—শতেক যোজন সমুদ্রের আমি দশ যোজন পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারি।

তারই সহোদর গবাক্ষ নামে এক বানর বীর বলল—

—আমি বিশ যোজন লঙ্ঘন করতে সক্ষম।

শরভ নামে এক সেনাপতি বলল—

—আমি চল্লিশ যোজন পর্যন্ত যেতে পারি।

আর এক বানর বীর গন্ধমাদন বলল—

—আমি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রম করতে পারি—

সুষেণ-পুত্র মহেন্দ্র বলল—

—ষাট যোজন পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা আমার আছে।

তার সহোদর দেবেন্দ্র বলল—

—আমি সত্তর যোজন পর্যন্ত যেতে পারি।

বিশ্বকর্মার পুত্র নল বললো।

—সমুদ্রের আশি যোজন পর্যন্ত অতিক্রমের ক্ষমতা আমার আছে।

এবার অগ্নির পুত্র নীল বলল—

—আমি নব্বই যোজন পর্যন্ত লঙ্ঘন করতে পারি।

বানর বীরদের উত্তর শুনে প্রাজ্ঞ জাম্ববান বলল—

—আমি বৃদ্ধ হয়েছি, যৌবনের সেই তেজ আর নেই। এক সময়ে খেলাচ্ছলে সমুদ্র পেরোতাম। আজ আমি অপরাগ।

অঙ্গদ এতক্ষণ চুপ ছিলেন এবার বললেন—

—আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি কিন্তু ফিরে আসতে পারব কিনা সন্দেহ।

হনুমান বানরদের আড়ালে থেকে বানর বীরদের কথা শুনছিল। জাম্ববান বলল—

—সবার কথা শোনা হলো, নিজের কথাও বললাম। প্রকৃতপক্ষে যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে মাতাসীতার সংবাদ নিয়ে আসতে পারে সে এখনও কিছু বলেনি। আমি হনুমানের কথা বলছিলাম। এখানে উপস্থিত থাকলেও সে এখনও নিশ্চুপ। অথচ তার অলৌকিক শক্তির কথা আমরা জানি। জন্ম থেকে পবননন্দন মহাবলশালী এবং অকুতো ভয়। শৈশবে ফল ভেবে বালসূর্যকে ধরতে যায়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে হনু (চোয়াল) ভেঙে যায় বলে নাম হয় হনুমান। শৈশবেই দেবতাদের আশীর্বাদে পুষ্ট। জগতে হেন কোনো কঠিন কাজ নেই যা হনুমানের দ্বারা সম্ভব নয়। হনুমান অবলীলায় সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কা থেকে সীতা মাতার সন্ধান নিয়ে আসতে পারে। আমি হনুমানকে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছি।

উঠে দাঁড়াল হনুমান যেন এক সতেজ পর্বত। শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিয়ে বলল—

—আমার রাজা সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ এবং বানরকুলের সম্মান রক্ষার্থে আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের এই কাজ অবশ্যই করবো। মহা বিহঙ্গ সম্পাতি এবং তার পুত্র সুপার্শ্বের বিবরণ অনুযায়ী আমারও দৃঢ় বিশ্বাস মাতা সীতাকে দুরাত্মা রাবণ লঙ্কার কোনো সুরক্ষিত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। আমি সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী সীতার অন্বেষণ অবশ্যই করব। সাগর

লঙ্ঘনের জন্য আমি যখন লাফ দেবো তখন ধরণী আমার ভার সহ্য করতে পারবে না। তাই আমি মহেন্দ্র পর্বত থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হব।

শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবানকে আলিঙ্গন এবং অন্যান্য বানর বীরদের সম্ভাষণ করে হনুমান চলল মহেন্দ্র পর্বতের উদ্দেশ্যে, তাকে অনুসরণ করল লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। বানরেরা উদ্যান থেকে পুষ্প চয়ন করে এক সুবৃহৎ মালা তৈরি করে হনুমানের গলায় পরিয়ে দিল। এইবার সকলের অনুমতি নিয়ে হনুমান গণেশাদি নানা দেবতার পূজা সম্পন্ন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করল। স্মরণ মাত্র শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের হৃদয়ে প্রকাশিত হলো। হনুমান রঘুপতি রাঘবের কাছে প্রার্থনা করল—

—হে প্রভু ! তুমি কৃপামৃত পারাবার। তোমার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। তোমার কৃপাকণাকে পাথেয় করে আমি সমুদ্র লঙ্ঘনের সাহস করেছি। যদি এই কর্মে আমি সফল হতে না পারি তবে তোমার কল্পতরু নামে কলঙ্ক হবে। হে কৃপাময় তুমি আমায় কৃপা কর।

হনুমানের এই প্রার্থনা শুনে ভগবান কটাক্ষে অনুমতি দিয়ে অন্তর থেকে অন্তর্ধান করলেন। হনুমান এখন নির্ভয়, তার মনে অদম্য সাহস। সমুদ্রকে তখন সে গোষ্পদের মতো দেখছে। প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে বলল—

—প্রভুর কৃপায় এই সমুদ্রকে আমি কোটিবার লঙ্ঘন করতে পারি। রাবণের লঙ্কাকে তুলে এনে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারি।

হনুমানের বাক্যশুনে বানরকুল হনুমানের জয়ধ্বনি দিল। হনুমান পুনরায় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ জাম্বমানকে প্রণাম করে এবং অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম অন্তরে স্মরণ করে সাগর লঙ্ঘনের জন্য দক্ষিণমুখে দাঁড়াল। আপন লীলায় দেহকে দশ যোজন বিস্তৃত করে এক পর্বতাকার ধারণ করল। পুচ্ছ হলো তার দ্বিগুণ। মনে হলো এক পর্বতের উপর আরেক পর্বত স্থাপিত হয়েছে। তার ভারে পর্বত থরহরি কম্পিত হলো। পশুপাখিরা সব ভয়ে চীৎকার করে ছুটাছুটি করতে লাগল। গগনবিদারী শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে নিমেষের মধ্যে আকাশে উঠল হনুমান। মারুতির বীরত্ব দেখে তুষ্ট হয়ে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

হনুমানের এহেন বীরত্ব দেখেও তার সাফল্য সম্পর্কে দেবতারা সন্ধিহান ছিলেন তাই তাকে পরীক্ষা করে তার বলবীর্য ও চাতুর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নাগমাতা সুরসার শরণাপন্ন হন। সুরসা দেবতাদের অনুরোধে রাক্ষসীর রূপ ধরে হনুমানের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সুরসা মুখ বিস্তার করে হনুমানকে গিলতে যায়। হনুমান তখন যুক্তকরে সুরসাকে অনুরোধ করে সে দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতামাতার সন্ধানে লঙ্কায় যাচ্ছে। যাকে রাবণ পঞ্চবটীর কুটির থেকে অপহরণ করে এনেছে। রাক্ষসী যেন তার গমন পথে বাধার সৃষ্টি না করে। শ্রীরাম জগতের হিতকারী তার কাজে বাধা দেওয়া অনুচিত। তখন সুরসা বলল—

—তোমার কথা আমি মানছি কিন্তু আমার কাছে এসে কোন প্রাণী ফিরে যেতে পারে না। তুমিও ফিরতে পারবে না।

রাক্ষসীর এহেন বাক্যে হনুমান কুপিত হয়ে বলল—

—রে দুষ্টা, তুই কোন মুখে তুই আমাকে ভক্ষণ করবি সেই মুখ দেখা আমি প্রবেশ করি। আমার দেহ দশ যোজন বিস্তৃত।

হনুমানের কথা শুনে সুরসা তার মুখ বিশ যোজন বিস্তৃত করে।

হনুমান তখন তার দেহকে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত করে। সুরসা মুখ বিস্তার করে চল্লিশ যোজন। এইভাবে হনুমান দেহ যত বৃদ্ধি করে সুরসাও মুখ ততোধিক বিস্তার করে। হনুমান যখন নব্বই যোজন দেহ বিস্তার করে তখন সুরসাও শত যোজন মুখ বিস্তার করে। তা দেখে হনুমান বিস্মিত হলো, ভাবল এ কোনো সাধারণ রাক্ষসী নয়। হনুমান তখন দেহ আরও বিস্তৃত করে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে রাক্ষসীর মুখে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী মুখ বন্ধ করে। হনুমান তখন এক ক্ষুদ্র মক্ষিকার রূপ ধারণ করে রাক্ষসীর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার নিজমূর্তি ধারণ করে। হনুমান বলে—

—তুমি নাগমাতা সুরসা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমার বচন রক্ষা করে আমি তোমার মুখে প্রবেশ করেছি। এখন আমাকে দয়া করে যেতে দাও আমি রামের কার্যে সীতার সন্ধানে চলেছি। তুমি যদি নিতান্তই আমাকে খেতে চাও তবে একটু বিলম্ব করো আমি শ্রীরামের কার্য সম্পন্ন করে স্বেচ্ছায় তোমার মুখে এসে প্রবেশ করব।

তখন সুরসা নিজ মুর্তি ধারণ করে বলল।

—আমি নাগমাতা সুরসা, এতক্ষণ দেবতাদের অনুরোধে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। সত্যি তুমি এই কাজের যোগ্যতম। তোমার বিকল্প নেই। তুমি রাম-সীতার মিলন ঘটাতে পারবে। অমরমণ্ডলী তোমায় আশীর্বাদ করুন। আপন কার্যে তুমি সফল হও।

মারুতির বল-বীর্য-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে দেবতারা প্রশংসা করলেন। হনুমান চলল আপন পথে, এখনো অনেকটা পথ বাকি। হনুমান ক্লান্ত, সমুদ্র চিন্তিত হলেন। যে সগর বংশ থেকে সমুদ্রের উৎপত্তি সেই সগর কুলোদ্ভূত শ্রীরামচন্দ্রের কার্যোদ্ধারে চলেছে পবননন্দন। ক্লান্ত পবন নন্দনের বিশ্রামের ব্যবস্থা সমুদ্রের কর্তব্য। বারিধির মনে পড়লো তার আশ্রিত মৈনাক পর্বতের কথা। ইন্দ্রের ভয়ে হিমালয় পুত্র মৈনাক সমুদ্রে লুকিয়ে আছে। এক সময়ে সব পর্বতের পাখা ছিল। ইন্দ্র সকল পর্বতের পাখা ছিন্ন করতে শুরু করলেন বজ্রের দ্বারা। সব পর্বত পক্ষহীন হলো, একমাত্র মৈনাক সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়ে পক্ষ রক্ষা করতে

পেরেছিল। মৈনাক কৃতজ্ঞ সমুদ্রের কাছে। সমুদ্র মৈনাককে ডেকে বলল এই সময়ে বিপুল অবয়বে সমুদ্রের উপর অবস্থান করে পথশ্রান্ত পবন নন্দনকে কিছু সময় বিশ্রমের অবকাশ দেওয়ার জন্য। মৈনাক শ্রীরামের কর্মে রত পবনতনয় হনুমানকে সাহায্য করতে সানন্দে সম্মত হলো। পূর্ণাঙ্গ মৈনাক পর্বত সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করতে লাগল। দূর আকাশে হনুমানকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমে কাছে আরও কাছে। হনুমান হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে এক বিশাল পর্বত দেখে চিন্তিত হলো। তখন পর্বত মৈনাক মানুষের রূপ ধারণ করে আপন শৃঙ্গ থেকে হনুমানের উদ্দেশ্যে বলল।

—হে বায়ুপুত্র। আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি সগর-বংশীয় দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করতে চলেছ। তাই কৃতজ্ঞ সাগরের নির্দেশ মেনে আমি তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্য সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছি। আমার শৃঙ্গে তুমি বিশ্রাম করো দিব্য ফলমূল আহার কর, সুপেয় জল পান কর। বিশ্রামের পর তুমি হৃষ্ট মনে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করবে। আমি তোমার পরম সুহৃদ, তুমি আমার বাসনা সফল কর।

মৈনাকের বাক্য ও ব্যবহারে খুব হৃষ্ট হলো হনুমান। আকাশ থেকে বলল—

—হে গিরিবর! তোমার দর্শনে দিন সফল আমার। তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়িয়ে গেল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, শ্রম নিবৃত্ত হলো। তোমার আগ্রহে বিশ্রাম নেওয়া আমার উচিত, কিন্তু আমার সময় সাগর পারে সুহৃদ বন্ধুদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমুদ্র পার হয়ে আমি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করব। অতএব আমি বিশ্রাম করে সত্যভঙ্গ করতে পারব না। তবে তোমার ইচ্ছাও আমি অপূর্ণ রাখবো না এই আমি তোমাকে স্পর্শ করলাম।

এইকথা বলে দ্রুত নীচে নেমে হস্তদ্বারা মৈনাকের অঙ্গ স্পর্শ করে আবার আকাশে উড্ডীন হলো। ইন্দ্রাদি দেবগণ মৈনাকের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রশংসা করলেন। স্বয়ং ইন্দ্র মৈনাককে অভয় দিলেন সেই থেকে মৈনাক সমুদ্রের অতল থেকে উঠে সমুদ্রের উপরে স্থিত হলো। অনেক দূরে তখন সুশোভিত লঙ্কানগরী হনুমানের চোখে দৃশ্যমান হচ্ছে। এই সময় সিংহিকা নামে এক রাক্ষসীর চোখে পড়ে হনুমান। সেই রাক্ষসীর অলৌকিক ক্ষমতা, কোনো প্রাণীর ছায়া থেকে সে সেই প্রাণীকে আকর্ষণ করতে পারে। বলিষ্ঠ হনুমানকে দেখে উদরপূর্তি করার লোভে সমুদ্রে পতিত ছায়া থেকে হনুমানকে আকর্ষণ করতে থাকে রাক্ষসী। প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে হনুমান নীচের দিকে তাকাতে সেই ভীষণা রাক্ষসীকে দেখতে পায়। রাক্ষসী মুখ বিস্তার করে হনুমানকে গিলতে প্রস্তুত। রাক্ষসীকে দেখে হনুমান মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। সে নিজের দেহকে অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরে রাক্ষসীর বিস্তারিত মুখবিবরে প্রবেশ করে। শিকার ধরা পড়েছে ভেবে রাক্ষসী তার বিস্তৃত মুখ সংকুচিত করে শিকার গলাধকরণের চেষ্টা করে। হনুমান তখন রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ করে নখের আঘাতে তার দেহাভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত করে বিদীর্ণ করে। সেই আঘাতে রাক্ষসীর মৃত্যু হয়। জলচর প্রাণীরা আনন্দিত হয়ে তার দেহ ভক্ষণ করতে থাকে। যে সকল দেবতা গন্ধর্ব এই নিশাচরীর আকর্ষণের ভয়ে এই আকাশমার্গ পরিত্যাগ করেছিল তারা বায়ুপুত্রের জয়ধ্বনি দিল। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো। এরপর হনুমান লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত। কিন্তু এই বিশাল কলেবর নিয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলে সকলে ভীত হবে এবং উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন হবে। তাই হনুমান ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করল।

লঙ্কাপুরী দর্শন করে হনুমান অবাক হয়ে গেল। কাঞ্চন আর রজতে নির্মিত হর্ম্যসমূহ মণি মানিক্য খচিত। বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কার তুল্য নগরী ত্রিভুবনে নেই। হনুমান যত এগুচ্ছে বিস্ময় ততই বাড়ছে। পুষ্পিত তরুলতা, ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি, স্ফটিক নির্মিত জলাধার, সুরম্য কৃত্রিম শৈলমালা। এ যেন এক স্বপ্নপুরী। হঠাৎ হনুমানের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এক ভীষণ দর্শনা মূর্তি। ইনি কি দেবী, দানবী, রাক্ষসী না মানবী? হনুমান স্থির করতে পারল না। তাঁর ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতে ত্রিশূল। ত্রিনয়ন যেন তিনটি সূর্য। লোলজিহ্বা, বিকট দশনা। গাত্রবর্ণ মেঘের ন্যায়, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানা, গলায় মুণ্ডমালা। কর্ণ যুগলে মানিক কুণ্ডল। এই মূর্তিকে দেখে হনুমান চিন্তিত হলো। জোড়হাতে দেবীর সম্মুখে গিয়ে বলল—

—শাস্ত্রে দেবী চামুণ্ডার কথা শুনেছি। যিনি শিবের প্রেয়সী। তুমি কি সেই মাতা চামুণ্ডা? তুমি এই লঙ্কাপুরীতে কেন? তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি?

চামুণ্ডা বললেন—

—আমি শঙ্করপত্নী চামুণ্ডা। স্বামীর আজ্ঞায় আমার লঙ্কায় বসতি। যখন স্বয়ং ব্রহ্মা এই লঙ্কাপুরী সৃজন করেছেন তখন থেকে আমি লঙ্কাপুরী রক্ষা করে আসছি। শিবকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাকে কতকাল লঙ্কায় থাকতে হবে? উত্তরে শঙ্কর বলেছিলেন, অযোধ্যার দশরথের পুত্র রূপে শ্রীরামের জন্ম হবে। তাঁর পত্নী সীতা সতীকে রাবণ হরণ করে লঙ্কায় আনবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতার সন্ধানে চর হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাবে। তুমি যখন হনুমানকে লঙ্কায় দেখবে সেই মুহূর্তে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে চলে আসবে। যতদিন হনুমান না আসে ততদিন আমি লঙ্কা ত্যাগ করে যেতে পারছি না। এইবার বল তুমি কে? কেন লঙ্কায় এলে? আর এই দুস্তর সমুদ্রই বা তুমি পার হলে কিভাবে?

এইবার হনুমান বলল—

—মাতঃ! আমিই প্রভু শ্রীরামের দূত হনুমান। মাতা সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় এসেছি। আর প্রভুর কৃপায় সমুদ্র লঙ্ঘন

করেছি।

শিবের নির্দেশ অনুযায়ী হনুমানকে লঙ্কায় দেখে চামুণ্ডা লঙ্কা পরিত্যাগ করে স্বস্থানে চলে গেলেন।

চামুণ্ডার প্রস্থানের পর হনুমান এবার নির্ভয়ে ঘুরতে লাগল লঙ্কাপুরীতে। কত উদ্যান, সরোবর, দিঘি, প্রাসাদ কিন্তু কোথায় মাতা সীতা! সীতাকে হনুমান কখনো দেখেনি। হনুমান ভাবছে যেখানে নারীদের হাস্য পরিহাস থাকবে সেখানে সীতা থাকবেন না। সীতার চোখে সব সময় জল থাকবে, মলিন বসনা, কৃশাঙ্গী হবে সীতা। সূর্যদেব তখন অস্তাচলে, হনুমান এক উঁচু প্রাচীরের উপর উঠে সবদিক পর্যবেক্ষণ করছে। লঙ্কার প্রাসাদসমূহ গগন চুম্বি, রাক্ষস সেনারা সর্বদা রণসাজে সুসজ্জিত। লঙ্কাপুরে রাবণের দুর্জয় প্রতাপ। তাকে পরাজিত করা বানর সেনাদের পক্ষে অসম্ভব। বানরদের মধ্যে শুধুমাত্র চারজন সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় আসতে পারে স্বয়ং হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল। বাকি বানর সেনাদের পক্ষে সাগর লঙ্ঘন অসম্ভব। রজনী সমাগত হলে হনুমান ক্ষুদ্র নেউলের রূপ ধারণ করে রাক্ষস বীরদের প্রাসাদ সমূহ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অতি সুশোভন রাজভ্রাতা বিভীষণের প্রাসাদ। উল্কাজিহ্ব, বিদ্যুৎজিহ্ব, বিদ্যুম্মালী, শুক সারনের আবাস দেখে হনুমান। একে একে দেখে নেয় লঙ্কার সব আবাস। কিন্তু কোথাও মাতা সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হনুমান সাবধানে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। শত শত অস্ত্রধারী দুর্জয় রাক্ষসেরা প্রাসাদ রক্ষা করছে। অতি সংগোপনে হনুমান রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। রাবণ শুয়ে আছে রত্নখাটে পাশে এক পরমা সুন্দরী। হনুমান ভাবল এই বুঝি সীতা। শ্রীরামের ন্যায় রূপবান ও গুণবান পুরুষ জগতে দ্বিতীয়টি নেই। সেই শ্রীরামের ঘরনি সীতা রাবণকে ভজনা করবে এ অবিশ্বাস্য। এ নিশ্চয় ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী। এই কক্ষের চারদিকে দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, দানব এবং সুন্দরী রাক্ষস কন্যাগণ নিদ্রায় অচেতন হয়ে ভূমিতে লোটাচ্ছে। হনুমান একে একে সকলকে নিরীক্ষণ করে দেখল সীতার লক্ষণযুক্ত একজনও নেই। নারীরা সব উলঙ্গ, উন্মত্ত, কুৎসিত আকার। সম্পাতি ও তার পুত্র সুপার্শ্বের কথায় বিশ্বাস করে হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কায় এসেছে। সারা লঙ্কা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কোথাও সীতার সন্ধান পায়নি। সীতার সন্ধান না নিয়ে হনুমান লঙ্কা থেকে ফিরবে না। লঙ্কায় সে আত্মহত্যা করবে। বীর হনুমান এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। সত্তর যোজন দীর্ঘ লঙ্কার প্রাচীর, সেই প্রাচীরের উপর বসে হনুমান সম্পূর্ণ লঙ্কা অবলোকন করছে। মাতাসীতা এই লঙ্কায় নেই সম্পাতি সুপার্শ্ব এরা ভুল তথ্য দিয়েছে। হতাশ হনুমান সেই প্রাচীরের উপর বসে ক্রন্দন করছে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্র খুঁজে এসেছে হনুমান। কোথাও সীতামায়ের সন্ধান পায়নি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে কী বলে প্রবোধ দেবে সেই চিন্তায় ক্লিষ্ট হনুমান। সে ভাবছে ফিরে গিয়ে সে আগে সুগ্রীবকে বধ করবে পরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে নিজে আত্মাহুতি দেবে। হনুমান সীতামাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন যেন একবার দর্শন দেন। এইবার হঠাৎ হনুমানের দৃষ্টি গোচর হয় অশোক বন। নানা ফুলে ফলে সুশোভিত এই বন। কোকিলের কুহুতান আর ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। অশোকবন দেখে হনুমানের মনে আশার সঞ্চার হলো যে এখানে হয়তো সীতামাতা থাকতে পারেন। ওখানে গেলে সীতামাতার দর্শন পাওয়া যাবে। চোখের জল মুছে হনুমান আপন দেহকে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির করে অশোক বনে প্রবেশ করল। কাননের এক অতি উচ্চ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করে হনুমান কাননের চারদিকে অবলোকন করতে লাগল। এই বনে রাবণের চেড়িরা সব ইতস্তত বিচরণ করছে। সব বিকট দর্শনা হাতে অস্ত্র কিংবা গাছের ডাল সবাই সদা সতর্ক। তারা যে কিছু পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ হনুমানের নজরে এল এক বিশাল বৃক্ষের নীচে এক নারী বসে আছে। তার অবিন্যস্ত কেশ, মলিন মুখ, মলিন বসন। তবে তার অঙ্গ থেকে যেন এক স্নিগ্ধ জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। হনুমান ভাবল ইনি হয়তো সীতামাতা। আরও নিশ্চিত হবার জন্য হনুমান দ্রুত নীচে নেমে এই নারীর কাছাকাছি চলে এল। হনুমান স্পষ্ট শুনল নারী 'শ্রীরাম' বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। 'কোথায় প্রভু শ্রীরাম' বলে রোদন করছেন। ইনি যে সীতামাতা এ বিষয়ে হনুমানের আর সন্দেহ রইল না। তবে সীতামাতার দুঃখে হনুমান বিচলিত। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। হনুমান ভাবছে কী করে প্রভু শ্রীরাম ও মাতা সীতার মিলন ঘটানো যায়। মুহূর্তের মধ্যে রাক্ষসীদের মেরে সীতাকে উদ্ধার করে সমুদ্র লঙ্ঘন করে বানরশিবিরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পৌঁছানো যায়। কিন্তু সেটা কি সমীচীন হবে? এমন সময় হনুমান লক্ষ্য করল অনেকগুলি মশাল অশোক বনের দিকে এগিয়ে আসছে। হনুমান সচকিত হয়ে নিজেকে শিংশপার শাখাপ্রশাখা আর পত্রের আড়ালে রেখে মশালের দিকে দৃষ্টি রাখল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাবণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। অতিরিক্ত মধুপানে কামার্ত রাবণের মনে হলো সীতার কথা। সেই রাতেই অনুচরদের নিয়ে রাবণ এল অশোক কাননে। এই সেই অনুচরদের মশালের আলো। সীতার কাছাকাছি আসতে অনুচররা থেমে গেল। রাবণ এগিয়ে এল সীতার দিকে। শিংশপা গাছের উপর থেকে হনুমান দেখছে রাবণ কী করে। আর মাতাসীতাই-বা কী করেন। যদি রাবণ সীতামাতাকে অপমান করতে উদ্যত হয় তবে হনুমান মুষ্টাঘাতে রাবণের মস্তক বিদীর্ণ করে দেবে। এদিকে রাবণকে দেখতে পেয়ে মাতাসীতা মলিন বসন দিয়ে নিজের অঙ্গ ঢেকে অধোবদনে বসে রইলেন আর বলতে লাগলেন—

—রক্ষা করো শ্রীরাম।

আলুলায়িতা কেশী, মলিনবসনা সীতার রূপের আলোয় অশোক কানন উদ্ভাসিত। কামার্ত রাবণ সীতার দিকে তাকিয়ে বলল—

—মাথা নীচু করে রইলে কেন জনক নন্দিনী। অভিমান ত্যাগ করে আমার দিকে তাকাও। দশ হাজার দেব এবং গন্ধর্ব কন্যাকে আমি বিবাহ করেছি। তুমি আমার পাটরানি হয়ে সিংহাসনে বসো। এই মলিন বসন ছেড়ে সর্বাঙ্গে রাজ আভরণ পরিধান কর। আমি রাজা দশানন তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। লঙ্কাপুরীতে দেবতারাও আসতে পারে না। তবে কাকে তোমার ভয়? তোমাকে বলপ্রয়োগ করে তুলে এনেছি, এটাই বলবান রাক্ষসের ধর্ম। হে সুবদনী, তোমার উপমা ত্রিভুবনে নেই। রামের সেবা করে তোমার জীবন গেল দুঃখে। আমার রাণি হয়ে তুমি যথেচ্ছ সুখ ভোগ করো। ওই রাজ্যহারা বনবাসী দুর্বল রামের কথা ভুলে যাও। রাম এতদিনে নিশ্চয় নিশাচরের পেটে গেছে। রতিশাস্ত্রে আমি সুপণ্ডিত, রতি সুখে আমিই তোমার জীবন ভরিয়ে দিতে পারি। আমি তোমার সেবক, তুমি আমার ঈশ্বরী। আজ্ঞা করো তোমাকে অন্তপুরে নিয়ে যাই।

রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হনুমান ভাবছে আর কালবিলম্ব না করে এইবার স্বমূর্তি ধারণ করে বজ্রমুষ্টিতে রাবণের মস্তক বিচূর্ণ করে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা উচিত। তবে একবার দেখা দরকার সীতামাতা রাবণের কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলেন কিনা?

রাবণের বাক্যশুনে সীতা রাবণের দিকে পেছন ফিরে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

—আমি রাজর্ষি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, শ্রীরামের বনিতা। আমি বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তোমার কাল উপস্থিত তাই শৃগাল হয়ে সিংহের সঙ্গে বিবাদ করছ। তোমার সবংশে বিনাশ অনিবার্য, অমৃত পান করলেও তুমি শ্রীরামের বাণ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। আর আমার অভিশাপে এই স্বর্ণলঙ্কা শ্মশানে পরিণত হবে।

সতীসাধ্বী সীতামাতার তেজোদীপ্ত বচন শুনে হনুমান শিংশপার পত্রপল্লবের আড়াল থেকে ভক্তিভরে সীতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। রাবণ এতক্ষণ নিঃশব্দে সীতার কথা শুনেছে, এবার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে এক চেরীর হাত থেকে এক বিশাল খড়্গ নিয়ে সীতার দিকে তেড়ে গেল। বলল—

—তোর এত অহঙ্কার আজ আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই। এই খড়্গ দিয়ে আজ তোকে দ্বিখণ্ডিত করব, দেখি রাম তোকে রক্ষা করতে পারে কিনা?

সম্মুখে খড়্গ হাতে কালান্তক যমের ন্যায় রাবণকে দেখে সীতা দুই হাত তুলে বলল—

—হে শ্রীরাম, তুমি তোমার সীতাকে রক্ষা কর। মৃত্যুভয়ে আমি ভীতা নই, তবে একমাত্র দুঃখ মৃত্যুকালে তোমার দর্শন পেলাম না। এবার রাবণের দিকে তাকিয়ে বলল—

—লঙ্কেশ্বর, তুমি আমার প্রাণ নাও, শুধু আমার শেষ মিনতিটুকু রাখ। শ্রীরামের রাতুল চরণ ধ্যান করার জন্য আমাকে ক্ষণিক সময় দাও। মৃত্যুকালে তাঁর চরণ ধ্যান করলে পরজন্মেও তিনি আমার পতি হবেন।

সীতাদেবী হাত জোড় করে অধোমুখে বসলেন। রাবণের অনুসরণ করে রানি মন্দোদরী সখী পরিবেষ্টিত হয়ে ততক্ষণে অশোককাননে উপস্থিত হয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি সব দৃশ্য দেখছেন। এদিকে হনুমানও প্রস্তুত যদি রাবণ সীতামাতার প্রাণ সংহারের জন্য খড়্গ উত্তোলন করে তবে সেই খড়্গ কেড়ে নিয়ে রাবণকেই যমালয়ে পাঠাবে।

রাবণ কিন্তু খড়্গ উত্তোলন করল না। সীতাকে আবার বলল—

—সীতা, তুমি এবার রাম নাম ছেড়ে আমার ভজনা কর। নচেত এই মুহূর্তেই তোমার জীবন অবসান হবে।

মাতাসীতা বললেন—

—তোমার ওই খড়গকে আমি ভয় করি না। আমার জীবনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ আসার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

মন্দোদরী এবার এগিয়ে এসে রাবণকে বলল—

—দেখ, সীতা দেবতাও নয়, গন্ধর্বও নয়। সীতা মানবী, সতী সাধ্বী, মহীয়সী। সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও। শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। এদের সঙ্গে বিরোধ করে নিজের এবং রাক্ষসকুলের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

মন্দোদরীর কোন কথা রাবণের কানে গেল না। সীতাকে দেখে কামে অচেতন রাবণ তখন খড়্গ ফেলে সীতাকে ধরতে গেল। মন্দোদরী সর্বশক্তি দিয়ে রাবণকে বাধা দিয়ে বলল—

—লঙ্কেশ্বর, তুমি কুবেরের সেই শাপের কথা ভুলে গেলে? বলপূর্বক শৃঙ্গার করলে তোমার মৃত্যু হবে। আমার বলছি লক্ষ্মী অংশে জন্ম সীতাদেবীর। তাঁকে অপমান করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

মন্দোদরীর বাক্য আর সীতার ক্রন্দনে রাবণের চৈতন্য ফিরে এল। খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাবণ সীতার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দিল চেরীদের। তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে গেল। মন্দোদরী সখীদের নিয়ে রাবণকে অনুসরণ করল। রাবণ মন্দোদরী চলে গেলে সব চেরীরা সীতাকে ঘিরে ধরে বোঝাতে শুরু করে। রামের তুলনায় রাবণ সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। রামের অল্প ধন, স্বল্প জীবন। আর রাবণ চৌদ্দ যুগ রাজ্য ভোগ করবে। সীতা চেরীদের কথা গ্রাহ্য করছে না দেখে প্রভাসা নামে এক রাক্ষসী বলল—

—সীতা, যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়, তবে সীতাকে কেটে আমরা তার মাংস খাব। তবে এই কথা যেন ছোট রানি



সরমা জানতে না পারে, সে সীতার সখী আগে জানলে সে এই কথা রাজার কানে তুলে দেবে।

এইরকম আলোচনা হতে হতে একে একে চেরীরা ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের নাসিকা গর্জনে অশোক কানন কম্পিত হচ্ছে। আর সীতাদেবী শ্রীরাম শ্রীরাম বলে ক্রন্দন করছেন। হনুমান তখন ভাবল আত্মপ্রকাশ করার এই উপযুক্ত সময়। সেই বৃক্ষের উপরে বসে রাম নাম জপতে লাগল হনুমান যাতে সেই ধ্বনি সীতা মায়ের কানে পৌঁছায়। এই রাক্ষসপুরীতে রাম নাম শুনে সীতা হতচকিত হয়ে গেলেন। বললেন—

—এই নিষ্ঠুর লঙ্কাপুরীতে কে শোনালে মধুর রাম নাম? হৃদয় জুড়িয়ে গেল। হে রামভক্ত, একবার দেখা দাও।

এইবার হনুমান করজোড়ে সীতার সামনে এসে দাঁড়াল। হনুমানকে দেখে সীতা ভাবল এ নিশ্চয় রাবণের চর। ছদ্মবেশ ধারণ করে তাকে ভুলাতে এসেছে। হনুমান বলল—

—মাতা, ভয় পেয়ো না। আমি পবন নন্দন হনুমান। শ্রীরামের দাস। তোমার সন্ধানে সমুদ্র পেরিয়ে এই লঙ্কায় এসেছি। সমুদ্রের ওপারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অসংখ্য বানরসেনা অপেক্ষা করছে।

সীতা বললেন—এই রাক্ষসপুরীতে অহোরাত্র ছলনার মধ্যে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে তোমাকে দেখে আমার আপনজন বলে মনে হচ্ছে। যদি তুমি সত্যি শ্রীরামের দূত হও তবে আমাকে কোনো অভিজ্ঞান দেখাও।

হনুমান তখন কটিবন্ধের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত শ্রীরামের অঙ্গুরীয়টি বের করে সীতার সামনে রাখল। সীতা তাদের বিবাহের সময় পিতা জনকের দেওয়া অঙ্গুরীয়টি দেখেই চিনতে পারলেন। অঙ্গুরীয়টি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে হৃদয়ে স্থাপন করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

হনুমান সীতা মাতাকে প্রবোধ দিয়ে বলল—

—মা, তুমি কোনো চিন্তা করো না, প্রভু শ্রীরামের হাতে রাবণ আর রাক্ষসকুলের ধ্বংস অনিবার্য। বানররাজ সুগ্রীব প্রভুর সহায়, সঙ্গে অসংখ্য বানরসেনা। আর তোমার আদেশ পেলে তোমার এই ভক্তসন্তান একাই এই স্বর্ণলঙ্কাকে নরকে পরিণত করতে পারে।

হনুমানের বাক্যে সীতা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন কিন্তু ভয় তার গেল না। বললেন—

বৎস হনুমান, এই অশোককানন আমার কাছে শোকের কানন। এখানে সামান্য খাদ্যও আমার ভাগ্যে জোটেনি। একমাত্র রামনামই আমার পানীয়-আহার। এই নির্বান্ধবপুরীতে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভিষণের স্ত্রী আমার সখী। সে আসে আমার জন্য মাঝে মাঝে আহার্য বস্তুও নিয়ে আসে। চেরীরা সব কেড়ে খেয়ে নেয়। আজ সরমা আমার জন্য পাঁচটি ফল নিয়ে এসেছিল আমি লুকিয়ে রেখেছি। এই পাঁচটি ফল আমি তোমায় দিচ্ছি।

সীতা উদ্যানের এক গোপনস্থান থেকে পাঁচটি আম এনে হনুমানকে দিলেন। হনুমান বলল—

—মা, এখানেতো তোমার নিজের খাবার কিছু নেই। নিজে না খেয়ে এই ফলগুলি আমাকে কেন দিচ্ছ?

সীতা বললেন—এই পাঁচটি ফল তুমি নিয়ে যাবে। একটি ফল শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে দেবে, একটি ফল দেবর লক্ষ্মণকে দেবে, সকল বানরদের দুটি ফল দেবে আর একটি ফলের অর্ধেক রাজা সুগ্রীবকে দেবে, বাকি অর্ধেক তুমি খাবে।

হনুমান কৌতুক করে বলল—

—মাতা, এই অর্ধেক ফলে কি আমার উদরপূর্তি হবে? তুমি আদেশ করলে আমি সমুদ্রের সব জল নিমেষে শুষে নিতে পারি।

সীতা বললেন—

—তোমার মায়ের অবস্থাটা একবার বোঝ, এর থেকে বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা যে আমার নেই। তবে আমি বলছি এই অর্ধেক আমেই তোমার উদরপূর্তি হবে। আর যদি কোনদিন অযোধ্যায় যেতে পারি তবে তুমি যে খাদ্য যত খেতে পার তোমাকে খাওয়াব। হনুমান তুমি আমার দ্বিতীয় পিতা। রাজর্ষি জনক আমাকে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ শ্রীরামের বার্তা এনে তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার প্রাণ দান করলে। তুমি আজ আমার প্রাণদান করলে, আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই। আমার বরে তুমি চার যুগ অমর হবে। শস্ত্রের দ্বারা বধ্য হবে না, অগ্নির দ্বারা দাহ্য হবে না। কায়মনোবাক্যে যদি আমি সতী হই আমার বাক্য লঙ্ঘন হবে না।

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে সেই পঞ্চফল পরম যত্নে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে নেয়। হনুমান ভাবে সীতার জন্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে এক অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছিল এবার মাতা সীতার নিকট থেকেও প্রভুর জন্য একটি অভিজ্ঞান নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাতে প্রভুর প্রত্যয় হবে। সীতাদেবী বললেন—

—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্মিক বিভীষণ আমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য রাবণকে অনেক বুঝিয়েছে। লঙ্কার এক সদাশয় প্রবীণ রাক্ষস অরবিন্দ আমাকে শ্রীরামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় করেছে কিন্তু রাবণ কারও কথায় কর্ণপাত করেনি। বিভীষণের এক কন্যা তার নাম সানন্দা। সরমা তাকে আমার কাছে পাঠায় তার কাছ থেকে আমি এই বিবরণ শুনেছি। যুদ্ধ বিনা আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তোমাদের সেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

হনুমান বলল—

—যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। তুমি আমার পিঠে আরোহণ কর আমি তোমাকে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বলো আমি মৃগ হবো না, পক্ষী, তুমি কীসে অরোহণ করবে?

সীতাদেবী বললেন—

—তুমিতো এক ক্ষুদ্রাকৃতি বানর। কী করে আমাকে বহন করে শ্রীরামের কাছে নিয়ে যাবে? বলেছ এতেই আমার শান্তি।

সীতা এই বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান নিজের দেহকে আশি যোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করল। মাথা গিয়ে ঠেকল আকাশে। হনুমানের বীরত্ব ও সততা সম্পর্কে সীতার আর কোনো সন্দেহ রইল না। হয়তো দীর্ঘ আট মাস পর প্রথম মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। অশোকবনে আসার পর এই প্রথম সীতার মুখে হাসি দেখা গেল। স্মিত হেসে বললেন—

—আমার পুত্রের বীরত্ব সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার পুত্র দুরাত্মা রাবণের মতো মাতাকে চুরি করে নিয়ে যাবে কেন? যুদ্ধ করে মাতাকে উদ্ধার করবে। তবে যা করার দু'মাসের মধ্যে করবে। রাবণ আমাকে বৎসর কাল সময় দিয়েছে, দশ মাস অতিক্রান্ত, দু'মাস পরে তার কথায় রাজি না হলে সে আমাকে হত্যা করবে। স্মিত হাসি মিলিয়ে গিয়ে অশ্রুমুখী হয়ে উঠলেন সীতা। সীতাকে অশ্রুমুখী দেখে হনুমান বলল—

—মাতা, নিজেকে সম্বরণ কর, মুক্তি তোমার দুয়ারে। তুমি এখন আমাকে কোনো অভিজ্ঞান দাও যা আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাতে পারি যাতে তাঁর প্রত্যয় হয় যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

সীতাদেবী তাঁর মাথা থেকে একটি মণি খুলে হনুমানের

হাতে দিলেন। আর একটি সুরক্ষিত উদ্যান দেখিয়ে বললেন।

—ওইযে দেখছো ওইটি লঙ্কার বিখ্যাত অমৃত ফলের উদ্যান। তুমি ওই উদ্যানে প্রবেশ করে যথেচ্ছ ফল ভক্ষণ করে তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করো। বিলম্ব করো না, সূর্যোদয়ের পূর্বে এই পাপপুরী ত্যাগ কর।

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে বলল—

—বিদায় মা, আমি যাচ্ছি তবে এই মুহূর্তে আমি লঙ্কা ত্যাগ করছি না। এখানে আমার আরও কিছু কাজ আছে। তুমি ভয় পেয়ো না, নীরবে দেখতে থাকো।

হনুমানের কথা শুনে সীতা বললেন—বৎস, তুমি এই পুরীতে একা, অন্যদিকে অসংখ্য রাক্ষস। যা করার সাবধানে করবে।

হনুমান সম্মতি জানিয়ে আবার অতি ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই সুরক্ষিত অমৃত কাননে প্রবেশ করল। প্রথমে চুপিসারে একটি ফলবান বৃক্ষে আরোহণ করে ফল খেতে শুরু করল। ক্রমে একগাছ থেকে অন্য গাছে। তার উদর পুর্তি হলো, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ হলো। এবার গাছের ডাল ভেঙে, গাছ উপড়ে উৎপাত শুরু করল। দেখতে পেয়ে সশস্ত্র রক্ষীরা ছুটে এসে হনুমানকে যথেচ্ছ অস্ত্রাঘাত করতে লাগল। ইত্যবসরে হনুমান এক দীর্ঘ বৃক্ষ উৎপাটিত করে সেই রক্ষীদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করল। সেই আঘাতে অনেক রক্ষীর প্রাণ গেল, জীবিত কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে রাবণকে এই সংবাদ দিল। কোথাকার এক বানর এসে অমৃতবন ধ্বংস করেছে, বৃক্ষলতা উপড়ে ফেলেছে, রক্ষীদের প্রাণে মেরেছে, এখনও সে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাবণের প্রিয় অমৃতকানন ধ্বংস হয়েছে শুনে রাবণ ক্ষিপ্ত হলেন। তারপর ঘরবাড়ি ও বৃক্ষলতা ধ্বংস করছে এক বানর, ক্রুদ্ধ রাবণ সেই বাণরকে বন্দি অথবা হত্যা করার জন্য তৎক্ষণাৎ মূঢ় নামে এক রাক্ষস যোদ্ধাকে পাঠাল। হনুমান তখন প্রচুর অমৃত ফল খেয়ে হৃষ্টমনে প্রাচীরের উপর বসে আছে। মূঢ় হনুমানকে দেখে গদা হাতে হনুমানকে আঘাত করতে যায়। হনুমান সেই গদা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মূঢ় আবার এক বিশাল শূল দিয়ে হনুমানকে আঘাত করে অনুমান সেই শূলও কেড়ে নিয়ে এক গৃহের থাম উপড়ে মূঢ়কে আঘাত করে সেই আঘাতে মূঢ় অচৈতন্য হয়ে যায়। হনুমান মূঢ়ের পা দুটি ধরে তাকে লঙ্কার প্রাসাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। মূঢ়ের অনুচরেরা তখন সমবেতভাবে হনুমানকে আক্রমণ করে। হনুমান তাদের এক একজনকে ধরে আছড়ে মারতে থাকে। কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সংবাদ দেয়। হনুমান ততক্ষণে অশোক কাননের আশেপাশে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। রাবণ তখন অত্যন্ত বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রহস্তের পুত্র জাম্বুমালীকে পাঠাল হনুমানকে বন্দি করে আনতে। জাম্বুমালী কটক-সহ হনুমানকে আক্রমণ করে। নিরস্ত্র হনুমানের উপর জাম্বুমালী ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বর্ষণ করতে থাকে। হনুমানের দেহ রক্তাক্ত হয়। হনুমান তখন এক বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটিত করে জাম্বুমালীকে আক্রমণ করে। জাম্বুমালীর বাণের আঘাতে সেই শালবৃক্ষ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। হনুমান তখন এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড জাম্বুমালীর রথের উপর নিক্ষেপ করে সেই বিশাল পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে জাম্বুমালীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ভগ্নদূত গিয়ে রাবণকে জাম্বুমালীর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করলে রাবণ তখন বিড়ালাক্ষ, ধ্রম্রলোচন প্রমুখ সাত বীরকে পাঠাল হনুমানকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরে আনতে। সাত মহারথী অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সামন্ত রথ, অশ্ব, হস্তী নিয়ে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলো। জাম্বুমালীকে বধ করার পর হনুমান আবার সেই প্রাচীরের উপর বসে। অপেক্ষ এবার কে বা কারা আসে। হনুমান দেখতে পায় দূরে সাত মহারথী সৈন্যসামন্ত-সহ এগিয়ে আসছে। সহসা তাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে হনুমান পুনরায় সেই ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করল। কটক-সহ বিড়ালক্ষ প্রমুখ সেই সাত মহারথী অকুস্থলে এল জাম্বুমালী সহ সব মৃত রাক্ষস সেনাদের দেখে সনাক্ত করল, কিন্তু সেই বানরকে কোথাও দেখা গেল না। তারা নিশ্চিত হলো সেই বানর অনেক সেনা দেখে ভয়ে পালিয়েছে। তথাপি তারা অনেক তল্লাশি করল কিন্তু বানরকে পাওয়া গেল না। বানর ভয়ে পালিয়েছে এই সংবাদ রাবণকে দেবার জন্য তারা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন অন্তরালে থাকা ক্ষুদ্র হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে বিশাল শালবৃক্ষ সব উৎপাটিত করে রাক্ষস কটকের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল। বিড়ালাক্ষ, ধূম্রলোচনরা যখন বানর ফিরে এসেছে ভেবে ফিরে দাঁড়াল তখন অবিশ্রান্ত বিশাল বিশাল পাথর বৃষ্টি করে রাক্ষস সেনাদের ধ্বংস করল। এবারও যুদ্ধ জয় করে হনুমান প্রাচীরের উপর বসে অমৃত ফল খেতে লাগল। আবার ভগ্নদূত রাবণের কাছে গিয়ে এই সাত বীরের পরাজয়, মৃত্যুর সংবাদ জানাল।

রাবণ তখন বীরপুত্র অক্ষয় কুমারকে বানর হত্যার ভার দিয়ে সেনাধ্যক্ষ করে পাঠাল। বিশাল সেনাদল নিয়ে অক্ষয় কুমার হনুমানকে মারার জন্য অগ্রসর হলো। হনুমান তখনও সেই প্রাচীরের উপর বসে আছে। অক্ষয় হনুমানকে দেখে চিৎকার করে বলে। —আমি রাবণ আত্মজ, ইন্দ্রজিতের সহোদর অক্ষয় কুমার, আমার হাতে আজ তোর মৃত্যু নিশ্চিত। পারিস তো আত্মরক্ষা কর।

এই বলে অক্ষয় হনুমানকে লক্ষ্য করে এক সঙ্গে সহস্রবাণ নিক্ষেপ করে। হনুমান এক লাফে আকাশে উঠে যায়। বাণগুলি তার পায়ের নীচ দিয়ে চলে যায়। ক্রুদ্ধ অক্ষয় এবার তার মস্তক লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে। কয়েকটি বাণ হনুমানের অঙ্গে বিদ্ধ হয়। এতে হনুমানের ক্রোধ বেড়ে যায়।

ক্রুদ্ধ হনুমান একলাফে অক্ষয় কুমারের রথের উপর চড়ে

বসে আর মুষ্টাঘাতে রথ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় রথের অশ্ব ও সারথিকেও পিণ্ডাকৃতি করে। অক্ষয়কুমার অন্তরীক্ষে পলায়ন করে। হনুমান অক্ষয়ের দু'পা ধরে টেনে নামিয়ে ভূমিতে প্রচণ্ডভাবে আছাড় মারে। সেই আঘাতে অক্ষয়ের মস্তক ও হাড় চূর্ণ হয়ে যায়। হনুমান আবার প্রাচীরের উপর বসে অন্যকারও আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রিয় পুত্র অক্ষয় কুমারের মৃত্যু সংবাদ রাবণের কাছে পৌঁছে যায়।

অক্ষয়ের মৃত্যু সংবাদে চিন্তান্বিত রাবণ এবার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বানর বধে যাওয়ার আদেশ করলেন। পিতার আদেশ শুনে ইন্দ্রজিৎ ভাবছে এই বানরকে চক্ষুর নিমেষে বন্দি করে পিতার কাছে নিয়ে আসব। সুসজ্জিত রথে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বানরকে বন্দি করতে চলেছে সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষসসেনা। হনুমান মুখোমুখি হলো ইন্দ্রজিতের। বলল—

—নির্লজ্জ রাক্ষস! তোর পিতা দশসহস্র দেবকন্যাকে জোরপূর্বক বিবাহ করেছে তোর মাতা গন্ধর্ব কন্যা মন্দোদরী থাকা সত্ত্বেও আবার বনবাসী রামচন্দ্রের সতীসাধ্বী স্ত্রীকেও হরণ করে এনেছে। তোর পিতার পাপে এই রাক্ষস বংশ ধ্বংস হবে। পিতাকে বুঝিয়ে শ্রীরামের স্ত্রীকে শীঘ্র ফিরিয়ে দিতে বল। তবে হয়তো তোদের বংশ রক্ষা পাবে।

ইন্দ্রজিৎ বলল—

—রে দুষ্ট বানর, তোর কাছ থেকে আমি কোনো নীতিকথা শুনতে চাই না। তুই লঙ্কার অনেক ক্ষতি করেছিস, আমার ভাই অক্ষয় কুমারকে মেরেছিস। এবার তোর শেষ পরিণতি দেখ।

এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। হনুমান সব অস্ত্র অবলীলায় লুফে নিচ্ছে। সামনে বড়ো বড়ো গাছ, বিশাল আকৃতির পাথর কিছুই ব্যবহার করছে না। হনুমান শুধু আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ এবার পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করে হনুমানকে বন্দি করে ফেলে। হনুমান ভূতলে পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসেনারা এসে হনুমানকে ঘিরে ধরে আরও রজ্জু শিকলের দ্বারা বাঁধতে থাকে। হনুমান চাইলে মুহূর্তে এই পাশ ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু তাহলে রাবণের কাছে যাওয়া সহজ হবে না। বন্দি অবস্থায় ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই হনুমানকে রাবণের কাছে নিয়ে যাবে। এবার সত্যিই ইন্দ্রজিৎ সেনাদের আদেশ দিল এই বন্দি বানরকে পিতার সকাশে নিয়ে যেতে। ইন্দ্রজিৎ প্রাসাদের পথ ধরল। হনুমানও নিজের দেহকে সত্তর যোজন করে পথের উপর বসে রইল। রাক্ষসেরা আর তাকে নাড়াতে পারে না। হনুমান বলল রাজ সম্ভাষণে যাব আমাকে কাঁধে করে নিয়ে চল। রাক্ষসেরা হনুমানকে কাঁধে নিয়ে বাদ্য সহকারে রাবণের প্রাসাদে নিয়ে চলল। হনুমানের তখন জোর প্রস্রাব পেয়েছে সে রাক্ষসদের কাঁধের উপর প্রস্রাব করে দিল। রাক্ষসরা বলল—

—একি অকালে বিনা মেঘে বর্ষণ।

এক বুদ্ধিমান রাক্ষস বলল—বর্ষণ কোথায় এই বানর বেটা প্রস্রাব করে দিয়েছে।

রাক্ষসেরা হনুমানকে সেখানে ফেলে দেয়। হনুমান বলে—

—এখানে ফেললে কেন, আমাকে তোমাদের রাজা রাবণের কাছে নিয়ে চল। তোমাদের সেনাপতির তাই আদেশ।

তখন রাক্ষসেরা হনুমানকে টেনে নিয়ে প্রাসাদের সামনে হাজির করে। হনুমান তখন দেহকে এত বিস্তৃত করল যে প্রাসাদ দ্বারে দেহ আটকে গেল। অনুচরেরা গিয়ে রাবণকে বার্তা দিল। অনেক কষ্টে সেই দুষ্ট বানরকে বন্দি করে আনা হয়েছে কিন্তু তার দেহ প্রাসাদ দ্বারে আটকে যাচ্ছে।

রাবণ বলল—প্রাসাদ দ্বার ভেঙে তাকে নিয়ে এসো।

আদেশ পেয়ে রক্ষীরা প্রাসাদদ্বার ভেঙে হনুমানকে রাবণের সামনে উপস্থিত করলো। হনুমান রাবণের দিকে পেছন ফেরে বসল। প্রহস্ত তাকে রাবণের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—

—মুর্খ বানর, দেখ আমাদের রাজা দশানকে।

হনুমান রাবণের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল—

—ও তুই সেই রাবণ রাজা, সেই কোন্ কালে দেখেছি। যবে আমার রাজা বালি তোকে লেজ দিয়ে জড়িয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে ছিল আর তুই তখন কাতর স্বরে প্রাণভিক্ষা করেছিলি।

প্রহস্ত বলল—

—ওইসব প্রলাপ এখন বন্ধ কর। বল্ তুই কার চর হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছিস?

হনুমান বলল কেন বলব?

এবার বজ্রগম্ভীর স্বরে রাবণ বলল।

—কার কথায় তুই এই রাক্ষসের দেশে এসেছিস বল্। দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, কারা তোকে পাঠিয়েছে? সত্য কথা বললে তোকে মুক্তি দেব, অন্যথায় তোর মৃত্যুদণ্ড।

হনুমান বলল—

—আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত। যার ধর্মপত্নী জনক নন্দিনী সীতাকে তুই হরণ করেছিস। যে বালীর কাছে তুমি পরাজিত হয়েছ সেই বালীকে শ্রীরাম বধ করেছেন। বর্তমানে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব। আমি তারই প্রতিনিধি হয়ে সীতামায়ের সন্ধানে এসেছি। তার সন্ধানও পেয়েছি। তাঁকে আমি একাই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে প্রভু শ্রীরামের বদনাম হবে। তিনি বানর সেনা নিয়ে আসবেন। তোকে এবং সব দুরাচার রাক্ষসদের বধ করবেন। তোকে আমি এই মুহূর্তে বধ করতে পারতাম। কিন্তু তুই শ্রীরামের বধ্য তাই ছেড়ে দিলাম।

হনুমানের এহেন দুর্বিনীত বাক্যে দশানন রাবণ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তার শিরশ্ছেদের আদেশ দিল। রক্ষীরা যখন রাবণের আদেশ কার্যকর করতে তৎপর হলো তখন রাজভ্রাতা বিভীষণ করজোড়ে অগ্রজের প্রতি বলল—

—হে রাজন, দূত অবধ্য। এই বানর দূতের প্রাণ সংহার

করলে ত্রিভুবনে আপনার অকীর্তি থেকে যাবে। এই দুর্বল, মন্দবুদ্ধি বানরকে অন্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিন।

কথাটি রাবণের মনপুত হলো। রাবণ তখন আদেশ দিল—

—এই বানরকে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দাও।

প্রহস্ত বলল—

—মহারাজ বানরের সর্বাঙ্গে লোম। তার মাথায় তো চুল নেই।

রাবণ বলল—

তবে ওর লেজে আগুন লাগিয়ে দাও।

রাজাদেশ পেয়ে সেবক রাক্ষসেরা রাশি রাশি বস্ত্র আর কলসী কলসী তেল ঘৃত নিয়ে এল। হনুমান নিজের লেজ আরও প্রসারিত করল। সেবকরা মহাসুখে হনুমানের লেজে কাপড় জড়িয়ে ঘি তেল দিয়ে ভিজিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। ইন্ধন পেয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে লেলিহান রূপ ধারণ করল। কিন্তু জানকীর বরে এই অগ্নির তাপ হনুমানের দেহে লাগল না। সর্বাঙ্গ পাশবদ্ধ, হস্তপদ শৃঙ্খলিত হনুমানের কী হয়, কী করে হনুমান তার জন্য সমগ্র লঙ্কাবাসী উদগ্রীব। কয়েক জন চেরী গিয়ে সীতার কাছে সংবাদ দিল যে বানর তার কাছে এসেছিল তাকে কুমার ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে বদ্ধ করেছে। রাজার আদেশে তার লেজে আগুন লাগান হয়েছে। সব শুনে সীতা অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন। তার বরে, অগ্নিদেবের কৃপায় হনুমানের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

এদিকে হনুমানের লেজ জ্বলছে দাউ দাউ করে। দেহে নাগপাশ, কোমড়ে রজ্জু, হস্তপদ শৃঙ্খলিত। হনুমান বন্ধনমুক্ত হবার কোনো চেষ্টা করল না। শুধু বিশাল দেহটাকে সঙ্কুচিত করে নেউল প্রমাণ করল। খসে গেল সব বন্ধন, এবার হনুমান পূর্বরূপ ধারণ করে সামনে যা কিছু পাচ্ছে তা দিয়ে রাক্ষসদের আঘাত করছে। হনুমানের এই কাণ্ড দেখে রাক্ষসরা সব পালিয়ে গেল। এবার হনুমান এক প্রাসাদের উপর উঠে লেজ দিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। জ্বলে উঠল সেই প্রাসাদ, ক্রমে একের পর এক গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে লাগল, জ্বলছে লঙ্কাপুরী, চারদিকে রাক্ষসদের হাহাকার। হঠাৎ এক প্রাসাদে উঠে থমকে দাঁড়াল হনুমান। প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে শোনা যাচ্ছে 'জয় রাম', 'জয় রাম' ধ্বনি। এই প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করতে পারল না হনুমান। আসলে এই প্রাসাদটি ছিল বিভীষণের এবং রামনাম জপ করছিল বিভীষণের পুত্র তরণী সেন।

এই প্রাসাদ ছেড়ে হনুমান অন্যান্য গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে লাগল। পুত্রের সাহায্যের জন্য এসে যোগ দিল পিতা পবন দেব। প্রবল বায়ুপ্রবাহে অগ্নি দ্রুত ছড়াতে থাকে প্রাসাদ, অস্ত্রাগার, শস্যাগার কিছুই বাদ গেল না। ঘরে ঘরে পুড়ে মরলো অসংখ্য রাক্ষস রাক্ষসী। লঙ্কাপুরীতে শুধু রক্ষা পেল দুটি গৃহ— একটি ধর্মাত্মা বিভীষণের, অন্যটি ব্রহ্মার বরে বলীয়ান কুম্ভকর্ণের। গৃহমধ্যে ছমাসের নিদ্রায় নিদ্রিত রাক্ষস যুদ্ধে মৃত্যু তার ভবিতব্য, তাই সেই গৃহে আগুন লাগল না। লঙ্কাদহন যখন শেষপর্যায়ে তখন হনুমানের স্মরণ হলো এই দহনে মাতাসীতার কোনো ক্ষতি হয়েনি তো? যার জন্য এত কাণ্ড তিনি যদি না থাকেন..... হঠাৎ দৈববাণী হলো।

—হে পবননন্দন, সীতাদেবীর কোনো ক্ষতি হবে না তুমি নিশ্চিন্তে লঙ্কা দগ্ধ কর। দেবতার আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে আছে।

হনুমান হৃষ্টমনে লঙ্কা দহনকার্য সম্পন্ন করে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াল। পিতা পবনের স্পর্শে তার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। হনুমান দেখল কোমরবন্ধে মা সীতার দেওয়া সেই অভিজ্ঞানমণি আর পাঁচটি ফল আছে কিনা? সব ঠিকই আছে। কিন্তু তার লেজের আগুন তখনো নেভেনি। আগুন নেভানোর অনেক চেষ্টা করেও হনুমান ব্যর্থ হয়েছে। এবার সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, তার আগে একবার সীতামাতার সঙ্গে দেখা করে যাবে। সেই জ্বলন্ত পুচ্ছ নিয়ে হনুমান চলল অশোক কাননের দিকে। হনুমানকে ফিরে আসতে দেখে রাক্ষসরা আবার বিপদের আশঙ্কায় দিগ্‌বিদিগ্‌ ছুটতে শুরু করল। ততক্ষণে সরমা এসে সীতার কাছে সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছে। হনুমান যে কুশলে আছে তাও জানিয়েছে। এই সময়ে স্বয়ং হনুমান এসে উপস্থিত। সীতা সরমা দুজনকে প্রণাম করে হনুমান। বলে—

—মা, আমার এখানকার কাজ শেষ, এবার ওপারে বানর শিবিরে প্রভুর কাছে যেতে হবে। কিন্তু আমার লেজের আগুন কিছুতেই নিভছে না তুমি কি এর বৃত্তান্ত জান?

সীতা বললেন—

—তুমি মুখামৃত দাও তাতে অগ্নি নির্বাপিত হবে।

হনুমান তখন জ্বলন্ত লাঙ্গুল মুখে পুড়ে দিল। তাতে আগুন নিভল বটে কিন্তু হনুমানের মুখ পুড়ে গেল।

অশোক কাননে রাখা এক জলভর্তি হাঁড়িতে পোড়া মুখ দেখে হনুমান বলল—

—মাগো, তোমার কাজে এসে আমার মুখ পুড়ে গেল। আমাকে দেখে এখন জ্ঞাতিবর্গ হাসবে, বিদ্রূপ করবে।

সীতা হেসে বললেন—

—আক্ষেপ করো না পুত্র, তোমার জ্ঞাতিবর্গরাও আমার বাক্যে মুখ পোড়া হবে। তোমাকে আর কেউ বিদ্রূপ করতে পারবে না।

হনুমান বলল—

—মা, আমাকে এবার অনুমতি দাও আমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে প্রভুর কাছে সব নিবেদন করি।

সীতা বললেন—

—আমার কথা শোন। ইনি আমার সখী সরমা, এঁর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন তুমি ক্লান্ত, তাছাড়া অগ্নিতে তোমার দেহ কাতর। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন তুমি এই

অশোক কাননে আমার দৃষ্টির সামনে কদিন আত্মগোপন করে থাক।

হনুমান বলল—

—মা! তা সম্ভব নয় কারণ আমি ফিরে গেলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় আসবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি ফিরব তোমার উদ্ধারও তত তরান্বিত হবে। এখন আমায় বিদায় দাও মা। মাতা সরমা, আপনি মহিয়সী নারী। আপনি আমার মাকে দেখবেন। আপনি আছেন বলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারছি। আপনারা দু'জনে সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। বিদায় মায়েরা। মায়েদের চোখ অশ্রুসিক্ত।



হনুমান সীতা ও সরমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সমুদ্র তীরে গিয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিকে একবার তাকিয়ে উঠল এক উঁচু পাহাড় চূড়ায়। সেখান থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে এক লাফে উঠল আকাশমার্গে। হনুমানের ঘন ঘন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি পৌঁছে গেল উত্তর কূলে। জাম্ববান সেই ধ্বনি শুনতে পেয়ে সবাইকে ডেকে বলল।

—আমাদের হনুমান নিশ্চয় সব কাজ সমাধা করে ফিরে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হনুমান এক পর্বতশৃঙ্গে এসে নামল। হনুমানকে দেখতে পেয়ে সব বানরেরা ছুটে গেল তার কাছে। প্রথমে অঙ্গদ তাকে প্রণাম করল। জাম্ববান এবং অন্যান্য প্রবীণ বানরেরা হনুমানের সঙ্গে কোলাকুলি করে কুশল জিজ্ঞাসা করল। হনুমান বলল—

—সব শুভ, সব কথা বলছি। আগে চল যেখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব আছেন তাঁদের কাছে।

মনের আনন্দে সব বানরেরা মধুবনে ঢুকে প্রাণভরে মধুপান করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলো। রামচন্দ্রকে প্রণাম করে সীতার দেওয়া অভিজ্ঞান মণিটি শ্রীরামচন্দ্রকে দিল। সেই পাঁচটি আম সীতার নির্দেশ মতো বণ্টন করা হলো।

—সেই মণিটি হাতে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের দুচোখে অশ্রুধারা বইতে শুরু করল।

লক্ষ্মণ বলল—

—হে পবনপুত্র, সীতাদেবী কেমন আছেন, কেমন দেখলে তাকে?

হনুমান বলল

—প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্মরণ করে মা কোনোরকমে বেঁচে আছেন। অনাহারী, মলিন বসনা, মুক্তকেশী সীতামাতার উপর চেড়ীরা প্রচণ্ড অত্যাচার করছে। রাবণ এক বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এক বছর পরে রাবণের কথায় রাজি না হলে সেই রাক্ষস সীতামাতাকে হত্যা করবে। সীতামাতাকে লঙ্কার অশোক কাননে রাখা হয়েছে রাক্ষসী চেড়ীদের প্রহরায়। সেখানে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের স্ত্রী সরমা ও কন্যা সানন্দা একমাত্র সীতামাতার সহায়। রাবণের দেওয়া এক বৎসরের মধ্যে দশমাস অতিক্রান্ত আর দু'মাসের মধ্যেই মাতাকে উদ্ধার করতে হবে। এই কথাটি মাতা সীতা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়েছেন।

জাম্ববান হনুমানের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হনুমান তোমার মুখে কী হয়েছে? মুখটা কালো হয়ে গেছে কেন? এখানেও দেখছি তোমার প্রজাতির যারা ছিল সবার মুখ কাল হয়ে গেছে। এর কারণ কি তোমার জানা আছে?

হনুমান বলল—

—আমি সীতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাবণের কাছে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় রাক্ষসদের হাতে ধরা দিই। ইতিমধ্যে অনেক রাক্ষসকে মেরেছি বলে রাবণ আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। বিভীষণের অনুরোধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করলে আমার লেজে অগ্নিসংযোগের শাস্তি প্রদান করে। প্রচুর বস্ত্র ও ঘি তেল দিয়ে আমার লেজে অগ্নি সংযোগ করা হয়। সেই জ্বলন্ত লেজ দিয়ে আমি পিতা পবনদেবের সহায়তায় মাত্র দুটি গৃহ ছাড়া সমস্ত লঙ্কাপুরী দহন করি। দহনের পরও আমার লেজের আগুন নিভছে না দেখে আমি সীতামাতার কাছে এই অগ্নি নির্বাপণের উপায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি এই অগ্নিতে মুখামৃত প্রদানের পরামর্শ দেন আমি বুঝতে না পেরে পুরো লেজটাই মুখের মধ্যে পুরে দিই। তাতে আগুন নিভল কিন্তু আমার মুখ পুড়ে গেল। এনিয়ে আমার স্বজাতির কাছে মুখপোড়া রূপে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনতে হবে বলাতে মা বললেন তোমার স্বজাতির সবারই মুখ পোড়া হবে।

শ্রীরাম হনুমানকে বললেন।

—তুমি ধন্য হনুমান, ত্রিভুবনে তোমার তুল্য বীর আর নেই। আজ অমি তোমাকে কী দেব আমার তো কিছুই নেই। আমি নিজেকেই তোমার কাছে সমর্পণ করলাম।

এই কথা বলে শ্রীরাম হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। হনুমান শ্রীরামের পদযুগল জড়িয়ে ধরে বলল—

—দুর্বল হনুমানের তুমি একমাত্র বল। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই আমার সব কিছু। আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছ। আমার মনের বড়ো সাধ রামসীতা দুজনে মিলে আমার হৃদয়াসনে বসবে।

এইবার যাত্রা শুরু, শুভক্ষণ দেখে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান বানর সেনা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। অসংখ্য বানর সেনা উৎসাহভরে কলরব করতে করতে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছাল। সেখানেই তারা লতাপাতা দিয়ে ছাউনি তৈরি করল। চরমুখে রাবণ এই সংবাদ পেয়ে গেল।



সীতা হরণ, রাবণের অনাচার, হনুমানের লঙ্কায় আগমন, লঙ্কাদহন প্রভৃতি ঘটনায় বিচলিত হয়ে রাবণের মাতা বৃদ্ধা নিকষা চিন্তান্বিতা এবং রাবণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণের প্রাসাদ ত্যাগ করে বিভীষণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। বিভীষণও সীতা হরণ ও সীতার অপমান মেনে নিতে পারেনি। সমুদ্রের ওপারে শ্রীরামের শিবির স্থাপন এবং লঙ্কা আক্রমণের প্রস্তুতির সংবাদে বিচলিত বিভীষণ রাবণের রাজসভায় গেল। রাবণ তখন প্রহস্ত, ত্রিশিরা, অকম্পন, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রমুখ সেনানায়কদের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সেনাপতিদের এক-এক জন রাম-সহ বানর সেনাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো আস্ফালন করছে। বিভীষণ যথারীতি অগ্রজকে প্রণাম করে বলল—

—আমার একটি নিবেদন আছে অনুমতি করেন তো বলি।

বিভীষণ বিনয়ের সঙ্গে বলল—

—হে রাজন! আমি আপনার এবং লঙ্কার রাক্ষসকুলের হিতার্থে বলছি। এই সর্বনাশা যুদ্ধের পরিকল্পনা আপনি ত্যাগ করুন। জানকীকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে মিত্রতা করুন। অন্যথায় স্বর্ণলঙ্কা এবং রাক্ষসকূল ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিভীষণের হিতকারী বাক্য শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করল এবং বক্ষদেশে পদাঘাত করে তাকে লঙ্কা ত্যাগের আদেশ করল। ক্ষুব্ধ ব্যথিত বিভীষণ পরিজনদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলেন কৈলাসে। সেখানে দেবাদিদেব শঙ্কর এবং ভ্রাতা কুবেরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। তখন শঙ্করের আদেশে এবং ভ্রাতা কুবেরের পরামর্শে বিভীষণ চলে এলেন সমুদ্র তীরে শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে।

অন্তরীক্ষ পথে বিভীষণ আসছে। শ্রীরামের শিবিরের কাছাকাছি আসতে বানরসেনাদের নজরে আসে বিভীষণ। অন্তরীক্ষে এই মহাবল-পরাক্রমশালী বীরপুরুষকে দেখে রাবণ ভ্রমে বানরসেনা বড়ো বড়ো পাথর আর বৃক্ষ নিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। সবাই চীৎকার করছে—

—রাবণ এসেছে, মার মার।

অন্তরীক্ষ থেকে বিভীষণ বলছে আমি রাবণ নই। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ। শ্রীরামের চরণে শরণ নেওয়ার জন্য এসেছি।

মুখ্য বানরেরা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বিভীষণের আগমন সংবাদ দিলে শ্রীরাম সুগ্রীব, জাম্বুবান, অঙ্গদ প্রমুখদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। সুগ্রীব বলল, রাক্ষসজাতিকে বিশ্বাস নেই। ছল করে আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

প্রবীণ, জ্ঞানী জাম্ববান বলল।

—যুদ্ধের সময় শত্রুকে কাছে রাখা বিপদকে ডেকে আনা।

এই সময়ে বীর হনুমান এসে বলল—এই বিভীষণ আমার প্রাণদান করেছে। এঁর স্ত্রী, কন্যা অশোকবনে মাতা সীতার সহায়। এঁর পুত্র তরণী সেন সর্বদা রামনাম জপ করে। লঙ্কা দহনের সময় এর গৃহ থেকে আমি সেই ধ্বনি শুনেছি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যদি বিভীষণের মিত্রতা হয় তবে বিভীষণের সাহায্যেই রাবণ বধ সম্ভব হবে।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হনুমানের কথায় আমি বিভীষণকে আশ্রয় দেব। হনুমান যা প্রত্যক্ষ করেছে তার উপর ভিত্তি করে বিভীষণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। আর শাস্ত্রে আছে শরণাগতকে আশ্রয় না দিলে পরলোক নষ্ট হয়। তোমরা বিভীষণকে এখানে নিয়ে এস।

জোড় হাতে বিভীষণ এলে শ্রীরাম তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। বিভীষণ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীরামের কাছে ব্যক্ত করে। শ্রীরাম সেনাদের সমুদ্র থেকে জল নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। সমুদ্রের জলে সেই মুহূর্তে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। আর অগ্নি সাক্ষী করে বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হলেন।



হনুমানের দৌত্যে মিত্র বিভীষণ এখন শ্রীরামের অন্যতম পরামর্শদাতা। এখন সমুদ্র লঙ্ঘন করে যেতে হবে লঙ্কায়। হনুমান এক লাফে সাগর পেড়িয়ে লঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিশাল বানরসেনা সমুদ্র পেরুবে কী করে? বিভীষণের পরামর্শে সগরবংশীয় শ্রীরাম সাগরকে আহ্বান করলে সাগর এসে একটি সহজ উপায় বলে দেয়। বানরকটকে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামে এক বানর আছে। জহ্নুমুনির বরে তার হাতের স্পর্শ লাগলে সে পদার্থ জলে ভাসে। তাকে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব দাও

তার স্পর্শে পাষাণ আবার জলে ভাসবে।

নলকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সমুদ্র বন্ধনের। সব বানর পাথর জোগাচ্ছে, হনুমানও এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে এল, নল বাঁহাতে সেই প্রস্তরখণ্ড ধরে নিল। নলের এই ব্যবহারে হনুমান কুপিত হয়ে এক বিশাল পাহাড় তুলে নিয়ে এল। নল সেই বিশাল পাহাড় দেখে ভয় পেয়ে গেল, বাঁ হাত দূরে থাক দু'হাত এমন কী মস্তকেও সেই পাথর ধারণ অসম্ভব। সেই পাহাড় ধরতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। ক্রুদ্ধ হনুমানের অভিপ্রায় বুঝে নল ছুটে গিয়ে শ্রীরামের কাছে আশ্রয় নিল। শ্রীরাম হনুমানকে বুঝিয়ে শান্ত করে নলকে বাঁচালো। সেতু বন্ধনের কাজ সমাপ্ত হলো কিন্তু পাথরের ফাঁকগুলো থেকে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো দলে দলে কাঠবিড়ালী। তারা ধুলোবালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুর উপর গা ঝাড়তে লাগল তাতে তাদের গা থেকে ধুলোবালি পড়ে পাথরের ফাঁকগুলি বুজে গেল। সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালিরও অবদান থাকল।

ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত এক প্রশস্ত সেতু নির্মাণ হলো। নল পরীক্ষা করে দেখেছিল তার স্পর্শ ছাড়াও 'রাম' নাম লেখা শিলাখণ্ড জলে ভাসছে। নল নির্দেশ দিয়েছিল প্রত্যেক বানরকে শিলাখণ্ড জলে ফেলার আগে তাতে রামনাম লিখতে হবে। সেইমত সব শিলাখণ্ডে রামনাম লেখা ছিল। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করল। ছোটো বড়ো অসংখ্য বানর সবার মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। চরমুখে সংবাদ পেয়ে রাবণ প্রাসাদ শীর্ষে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকাল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। রাবণ লঙ্কা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিশাল প্রস্তর নির্মিত সেতু দেখল। অসংখ্য বানর এগিয়ে আসছে লঙ্কার দিকে। দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে যাবে লঙ্কায়। রাবণ তখন বিশ্বস্ত শুক ও সারণকে পাঠাল রামের বানর সেনাদের অবস্থান, গতিবিধি ও শক্তি জানার জন্য। বানরসেনারা ততক্ষণে লঙ্কাপুরী অবরোধ করে ফেলেছে। শুক সারণ তখন বানরের রূপ ধারণ করে বানরসেনাদের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু সতর্ক বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে গেল তারা। বিভীষণ এবং অন্যান্য বানর সেনাপতিরা তাদের মৃত্যু দণ্ড দিতে চাইলেও শ্রীরামের কৃপায় তারা মুক্তি পেয়ে লঙ্কায় রাবণের কাছে ফিরে গেল। রাবণ এবার পাঠাল আর এক চর শার্দূলকে। শার্দূলও বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে, শ্রীরামের কাছে নিয়ে গেলে শ্রীরাম তাকেও মুক্তি দেন। এবার রাবণ মায়াবী রাক্ষস বিদ্যুৎজ্জিহ্বকে দিয়ে অবিকল শ্রীরামের মায়া মুণ্ড নির্মাণ করিয়ে সীতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সীতা জানেন শ্রীরামচন্দ্র অবধ্য তাই তিনি ভয় পেলেন না।

বানর কর্তৃক লঙ্কা অবরোধের পাঁচ দিন হয়ে গেল কিন্তু রাবণ নিরুত্তাপ। এর কারণ জানার জন্য এবং সীতাকে ফিরিয়ে শ্রীরামের কাছে আত্মসমর্পণের বার্তা নিয়ে দূত রূপে অঙ্গদ রাবণের কাছে যায়। অঙ্গদকে অপমানিত করার চেষ্টা করলে অঙ্গদও রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করে রাবণের মস্তকের মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে বানর শিবিরে ফিরে আসে। এবার রাবণ রাক্ষস বীরদের আদেশ দেন রামচন্দ্রকে আক্রমণ করার জন্য। প্রথমে রণক্ষেত্রে আসে রাবণের বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করে। শ্রীরামচন্দ্র গরুড় পক্ষীকে স্মরণ করলে গরুড় এসে তাঁদের নাগপাশমুক্ত করে। তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। এরপর একে একে রাক্ষস সেনাপতি ধূম্রলোচণ, অকম্পন, বজ্রদংস্ট্র, প্রভৃতির বানর সেনাদের হাতে পরাজয় ও পতন ঘটে। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসে স্বয়ং রাবণ। প্রথমে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো সুগ্রীব। কিন্তু রাবণের বাণে কাতর হয়ে সুগ্রীবকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো। এবার এগিয়ে এল পবননন্দন হনুমান। এক লাফে রথে উঠে রাবণের বুকে এক বজ্রসম মুষ্টাঘাত করে। সেই আঘাতে মুর্ছিত হয়ে পড়ে রাবণ। মুর্চ্ছা ভঙ্গ হলে রাবণ হনুমানকে ডেকে বলে—

—তুই বীর বটে, তোর আঘাতে আমার শরীর কেঁপে উঠেছে। এবার তুই আমার আঘাত সামলা।

এই কথা বলে রাবণ হনুমানকে এক প্রচণ্ড চাপড় মারে, আর সেই আঘাতে হনুমান মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এইবার রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে বানরবীর নীল। বিশালদেহী নীল দেহের রূপান্তর ঘটিয়ে রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। রাবণ সুযোগ বুঝে বাণের আঘাতে নীলকে আহত করে। এবার এগিয়ে আসে লক্ষ্মণ। উভয়ের বাণ বর্ষণে সূর্যদেব আচ্ছাদিত হন। রাবণ পরিশেষে এক মন্ত্রপুত বাণের দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করে। তীব্র আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। মুর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে রাবণ রথে তুলে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্মণ এত ভারী হয়ে যায় যে রাবণ কুড়ি হাত দিয়েও লক্ষ্মণকে নাড়াতে পারে না। যে রাবণ বাঁ-হাত দিয়ে কৈলাস পর্বত অনায়াসে তুলেছে সে রাবণ এক তপস্বীর শরীর নাড়াতে পারল না। দূর থেকে হনুমান এই দৃশ্য দেখছিল। এবার কাছে এসে এক প্রচণ্ড চড় মারল রাবণের গালে। সেই এক চড়ে রাবণ ঘুরতে ঘুরতে রথের উপর গিয়ে পড়ল। চোখ মেলে হনুমানকে দেখে রাবণ রথ নিয়ে পালিয়ে গেল। এবার মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে হনুমান অনায়াসে কোলে তুলে শ্রীরামের কাছে নিয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র ধ্যানস্ত হয়ে স্পর্শ দ্বারা লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করেন।

পরের দিনের যুদ্ধে রাবণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আর শ্রীরাম পদব্রজে চলেছেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হনুমান এসে করজোড়ে বলল—প্রভু, রাবণ রথে বসে যুদ্ধ করবে। আর তুমি ভূমি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে লড়বে কী করে? তুমি আমার পিঠে আরোহণ করে রাবণকে বধ কর। হনুমানের পৃষ্ঠে শ্রীরাম যেন ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র। রাবণের সামনে গিয়ে শ্রীরাম বলতে

লাগলেন—

—রে পাপিষ্ঠ, দশমুখ নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেছ। এই দশ মুণ্ড কেটে আজ তোকে বধ করব।

রাবণ কিন্তু শ্রীরামের কোনো কথা শুনছে না। তার দৃষ্টি হনুমানের দিকে। এই সেই বানর সে অক্ষয় কুমারকে মেরেছে, অমৃত বন তছনচ করেছে, স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত করেছে। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে। পিঠে শ্রীরাম বানর নড়তে পারবে না, এইবেলা প্রতিশোধ। রাবণ বেছে বেছে চোখা চোখা বাণে হনুমানের শরীর জর্জরিত করে ফেলছে। পৃষ্ঠদেশে শ্রীরামচন্দ্র থাকায় হনুমান নড়তে পারছে না। তখন হনুমান তার দেহ বিস্তৃত করতে লাগল। দৈর্ঘে প্রস্থে তার দেহ হলো ত্রিশ যোজন। লেজ করল দীর্ঘ পঞ্চাশ যোজন, সেই লেজ আকাশে গিয়ে ঠেকছে। হনুমানের লেজ দেখে রাবণ ভয় পেল, যদি বালীর মতো আবার লেজ দিয়ে বেঁধে নেয়। শ্রীরামচন্দ্র যত বাণ ছুঁড়ছে রাবণ সব কেটে নিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র এবার ঐষিক বাণ সন্ধান করে রাবণের বুকে বিঁধলেন। সেই শরাঘাতে রাবণ অচৈতন্য হয়ে গেল। ক্ষণিক পরে চৈতন্য লাভ করলে শ্রীরাম বললেন—

আজ তোকে বধ করব না। আগে তোকে নির্বংশ করব



তারপর তোর মৃত্যু। তোকে মেরে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাব। শ্রীরামচন্দ্র এক তীক্ষ্ণ বাণে রাবণের দশমাথার মুকুট কেটে নিলেন। ভীত রাবণ কোনো রকমে রথে উঠে সারথিকে লঙ্কার দিকে রথ চালাতে নির্দেশ দিল।

পরের দিন বানরসেনারা আরও আগ্রসী হয়ে উঠল। প্রচণ্ড যুদ্ধে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহাপাশ ও সহোদর যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করল। এবার এল অতিকায়, রাবণের এই পুত্র অপরাজেয় লক্ষ্মণের বাণে সেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো। ভগ্নদূতের মুখে পুত্রের নিধন সংবাদ শুনে হতাশ রাবণ বিলাপ করতে লাগলেন। পিতার বিলাপ শুনে এগিয়ে এল বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজে আবার যুদ্ধে যাবার অভিপ্রায় জানাল। আশ্বাস দিল এবার নির্ঘাত বানরসেনা ধ্বংস করে রাম-লক্ষ্মণকে রাবণের সামনে এনে উপস্থিত করবে। রাক্ষস বাহিনী সুসজ্জিত হলো। যজ্ঞাগারে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করল ইন্দ্রজিৎ। দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে একে একে সমস্ত বানরবীর-সহ রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও আহত করে দিবাবসানে ইন্দ্রজিৎ কটক-সহ লঙ্কায় ফিরল। দূত মুখে ইন্দ্রজিতের বিজয় সংবাদ শুনে রাবণ আশ্বস্ত হলো, পুত্রকে আশীর্বাদ করল।

বানর শিবিরে তখন শোকের ছায়া। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহ সমস্ত বানর বীর ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে আহত মূর্চ্ছিত। বিভীষণও হতাশ, এই সময় প্রাজ্ঞ জাম্ববান হনুমানকে বলল হিমালয় থেকে সুবর্ণকরণী, অস্থিসঞ্চারিণী, মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধি নিয়ে আসার জন্য। হনুমান এক লাফে আকাশমার্গে উঠে হিমালয়ে পৌঁছে গেল। কিন্তু হনুমান এই ঔষধি চেনে না। রাগে ক্ষোভে হনুমান বনের বৃক্ষলতাদি উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। তখন পর্বতরাজ এক ঋষির রূপ ধরে হনুমানের সামনে এসে তার আগমন ও ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হনুমান ঋষির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে, রাম লক্ষ্মণ সহ বানর বীরদের আহত ও মূর্চ্ছিত হওয়ার কথা জানাল। ঋষি নিজে তখন পর্বতের এক স্থানে সেই ঔষধি গুল্মগুলি চিনিয়ে দিলেন। হনুমান সেই গুল্মগুলি উৎপাটিত করে ঋষিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করল। পবন বেগে হনুমান বানর শিবিরে উপস্থিত হলো। জাম্বমান তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ বানর সেনাদের সুস্থ করে তুলল। সুস্থ হয়ে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন—তুমি ভক্ত, বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার আমার অভিন্ন শরীর।

রজনীর তৃতীয় প্রহরে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে সমুদ্র তীর মুখরিত হলো। বিনিদ্র রাবণের কর্ণে পৌঁছাল সেই ধ্বনি।

পরদিন প্রাতে শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রণাসভা ডাকলেন। প্রাজ্ঞ জাম্ববান বানরসেনাদের আবার লঙ্কা দহন করার প্রস্তাব দিলে সবাই উৎফুল্ল হয়ে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুরু হয় দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন। চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন রাক্ষসদের মধ্যে হাহাকার পরে যায়। এইবার রাবণ আবার বানরসেনাদের আক্রমণ এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণের পুত্র বীর কুম্ভ ও নিকুম্ভ যুদ্ধে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধে অচিরেই তারা বীরগতি প্রাপ্ত হয়। এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো বীর মকরাক্ষ, তারও একই গতি হলো। এবার যুদ্ধে এল বিভীষণের পুত্র বিষ্ণুভক্ত তরণী সেন। শ্রীরামের হাতে মৃত্যু হলে মুক্ত হয়ে গোলকে বসতি হবে এই প্রত্যয়ে তরণী সেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। অশ্রু সম্বরণ করে বিভীষণ শ্রীরামের কাছে পুত্র পরিচয় দিল না। যুদ্ধে শ্রীরামের বাণে বীর তরণীর বীরগতি প্রাপ্ত হলো। এইবার যুদ্ধে এল রাবণ চিত্রাঙ্গদার পুত্র বিষ্ণুভক্ত বীরবাহু। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শ্রীরামের বাণে নিহত হয়ে বিষ্ণুপদে লীন হয়ে গেল। এইবার মহাবীর ভস্মলোচনও যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

লঙ্কা যখন বীরশূন্য তখন এক বীর কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। সে রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। ব্রহ্মার বরে সে ছ'মাস ঘুমোবে ছমাস জাগবে। জাগ্রত অবস্থায় সে অপরাজেয়। কিন্তু অসময়ে ঘুম ভাঙালে যুদ্ধে তার মৃত্যু অনিবার্য। লঙ্কা যখন বীরশূন্য তখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রার সময়। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য অনেক কৌশল করে তাকে জাগান হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেও মৃত্যুবরণ করল। এভাবে লঙ্কা যখন বীর শূন্য, হাহাকার করছে রাবণ, তখন আবার এল ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। রাবণ বলল—

—যত রাক্ষসবীর যুদ্ধে যাচ্ছে কেউ আর ফিরছে না। একমাত্র তুমি যুদ্ধ জয় করে ফিরেছ। বাসব বিজয়ী পুত্র আমার! তুমি আবার যুদ্ধে যাও রাম লক্ষ্মণ-সহ বানরকূল ধ্বংস কর।

ইন্দ্রজিৎ বলল—কতবার রাম-লক্ষ্মণকে মেরেছি কিন্তু তারাতো মরেও মরে না। এই শত্রু কী করে সংহার করব?

রাবণ বলল—

—তুমি আগে ওই হনুমানকে মারো। সেই সবাইকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ঔষধ এনে।

ইন্দ্রজিৎ আবার রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করল। এবার আর সামনা সামনি নয় মেঘের আড়াল থেকে। দলে দলে বানর সেনার প্রাণ যাচ্ছে। বানরেরা তখন ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামকে বললেন—

—মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ তার মাথার মণিমানিক্যের মুকুট জ্বলজ্বল করছে। তুমি এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাকে বধ কর।

মেঘের আড়াল থেকে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ এবার রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শ্রীরামচন্দ্র তখন মিত্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কীভাবে হবে?

লঙ্কার মধ্যে ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার আছে। সেখানে আহুতি দিয়ে যুদ্ধে এলে সে দেব দানব মানুষ্যের কাছে অপরাজেয়। ব্রহ্মার বিধান আছে, যে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভঙ্গ করবে তার হাতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হবে। ইন্দ্রজিৎ এখন নিশ্চয় সেই যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করছে। লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে যাক, যজ্ঞ ভঙ্গ করে ইন্দ্রজিৎকে বধ করুক। শ্রীরামের আদেশে বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে অদৃশ্যভাবে পৌঁছান সেই যজ্ঞাগার। তখন ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করছে, লক্ষ্মণ অতর্কিতে যজ্ঞ ভঙ্গ করে যজ্ঞস্থলেই ইন্দ্রজিতকে বধ করল। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণ আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলো।

লঙ্কার ঘরে ঘরে তখন পতিহারা, পুত্রহারা নারীদের ক্রন্দনের রোল। সবাই রাবণকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। রাবণ এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না। একবার সীতাকে বধ করার জন্য উদ্যত হলো। মন্দোদরী নিবারণ করল। এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে রাবণ চলল রণক্ষেত্রে, ডাক দিল রাক্ষসদের। সুসজ্জিত রথে রাবণ পুরী থেকে বেরিয়ে এলো। একে একে সব বানর বীরেরা আক্রমণ করল রাবণকে। রাবণের বাণে জর্জরিত হয়ে সব পালিয়ে গেল। রাবণের নির্দেশে সারথি রথ নিয়ে গেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ বিভীষণকে একসঙ্গে দেখে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে বিভীষণের দিকে শেল নিক্ষেপ করল। লক্ষ্মণের তিন বাণে সেই শেল চার টুকরো হয়ে গেল। এইবার রাবণ পুত্র হন্থা লক্ষ্মণের দিকে ময়দানব প্রদত্ত শক্তিশেল নিক্ষেপ করল। অগ্নির তেজে ছুটে আসছে শেল। শ্রীরাম করজোড়ে প্রার্থনা করলেন শেলকে ফিরে যেতে। শেলের মুখে বসা যমরাজ বললেন, এই শেল যখন যার হাতে তার আদেশ পালন করে। লক্ষ্মণকে এই শেল বিদ্ধ করবেই। শেল বিদ্ধ হলো লক্ষ্মণের বুকে। ভূতলে পতিত হলো লক্ষ্মণ। বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, নল, নীল সবাই চেষ্টা করেও লক্ষ্মণের বুক থেকে শেল বের করতে পারল না। শ্রীরাম তখন প্রচণ্ড ক্রোধে রাবণকে আক্রমন করলো। বৃষ্টির মতো বাণ বর্ষণে রক্তাক্ত হয়ে রাবণ লঙ্কাপুরীতে পালিয়ে গেল। পেছনে ছুটল বানরসেনা।

শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণ ভূমিতে পড়ে আছে, চারদিক ঘিরে আছে হনুমান, জাম্ববান, সুগ্রীব, নল, নীল প্রমুখ বানর। রাবণকে বিতাড়িত করে শ্রীরামচন্দ্র ফিরে এলেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে শ্রীরাম বিলাপ করতে লাগলেন। জাম্ববান বলল, বৈদ্যরাজ সুষেণ থাকে লঙ্কায়, তাকে নিয়ে এলে তার চিকিৎসায় লক্ষ্মণ বেঁচে যাবেন। হনুমান তৎক্ষণাৎ গিয়ে বৈদ্যরাজ সুষেণকে নিয়ে এল। সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করে দেখল, বলল—

—এখনও প্রাণের লক্ষণ আছে। রাতের মধ্যে একটা ঔষধি প্রয়োগ করতে পারলে লক্ষ্মণ বেঁচে যাবে। সুর্যোদয় হয়ে গেলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। সেই ঔষধি পাওয়া যায় গন্ধমাদন পর্বতে। তবে তা এখান থেকে আঠারো মাসের পথ।

শ্রীরামচন্দ্র-সহ সবাই তখন হনুমানের দিকে তাকাল। হনুমান বলল—

প্রভু শ্রীরামের কৃপা থাকলে এই আঠারো মাসের পথ একরাতে যাওয়া আসা সম্ভব। তোমরা লক্ষ্মণকে রক্ষা করো, আমি দ্রুত ঔষধি নিয়ে আসছি।

এই বলে হনুমান দ্রুত লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে চলল। হনুমানকে আকাশমার্গে দেখে রাবণ আগেই মায়াবী কালনেমিকে গন্ধমাদন পর্বতে পাঠিয়ে দিল। অনতি বিলম্বে হনুমান পৌঁছাল গন্ধমাদনে। সেখানে এক সরোবরে থাকে কুম্ভীর রূপে এক শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। কালনেমি তপস্বীর বেশ ধরে ছলনা করে হনুমানকে সেই সরোবরে স্নান করতে পাঠাল। হনুমানের স্পর্শে মুক্ত হলো সেই অপ্সরা। মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে যাবার সময় অপ্সরা হনুমানকে এই ভণ্ড তপস্বী সম্পর্কে সতর্ক করে যায়। হনুমান সেই কালনেমিকে হত্যা করে লঙ্কায় রাবণের সামনে ফেলে দেয়। এইবার গন্ধমাদনে ঔষধি সংগ্রহের পালা। হনুমান সেই ঔষধি চেনে না, অগত্যা পুরো পর্বতটাই উপড়ে নিয়ে চলল হনুমান। উত্তর থেকে দক্ষিণ যেতে যেতে মাঝখানে অযোধ্যা, নন্দীগ্রামে ভরত শত্রুঘ্ন সেখানে সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রেখে চামর ব্যজন করছে। হনুমান সেই পাদুকা অতিক্রম করে যাচ্ছে তাই ক্রুদ্ধ ভরত এক লোহার বাটুল ছুড়ে মারে হনুমানের দিকে। বাটুলের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে পর্বত সমেত ভূমিতে পড়ে হনুমান। জ্ঞান এলে সে 'শ্রীরাম' নাম করতে থাকে। ভরত শত্রুঘ্ন তাকে শ্রীরাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। গুরু বশিষ্ঠ এসে ভরতের কাছে হনুমানের পরিচয় দেয়। হনুমান জানায় রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত হয়ে মৃত্যুমুখে। বৈদ্যরাজ সুষেণের নির্দেশে সে ঔষধি নিতে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিল। ঔষধি চিনতে না পেরে হনুমান পর্বতশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভরত শত্রুঘ্নের হটকারিতায় এই বিপত্তি। হনুমান বলল ঔষধি রাতের মধ্যে প্রয়োগ করতে না পারলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের মৃত্যু অনিবার্য। লক্ষ্মণের মৃত্যু হলে লঙ্কার রাবণের কবল থেকে সীতা মাতাকে উদ্ধার করা যাবে না। আর শ্রীরাম আবার বনে প্রবেশ করবেন। ভরত নিঃসপত্ন হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। কৃতকর্মের জন্য ভরতের অনুশোচনা হলো। তিনি হনুমানের সঙ্গে লঙ্কায় শ্রীরামের কাছে যেতে চাইলেন। শ্রীরামের অনুমতি ছাড়া হনুমান ভরতকে সঙ্গে নিতে রাজি হলো না। ভরতের শক্তি পরীক্ষার জন্য বলল—

—আমি এখন এই পর্বত ভূমি থেকে তুলতে অক্ষম। যদি এক যোজন উঁচুতে তুলে দিতে পার তবে আমি নিয়ে যেতে পারব। শত্রুঘ্ন তির-ধনুক এনে দিলে ভরত ধনুকে তির যোজনা করে তার উপর পর্বত রেখে একশত যোজন উপরে তুলে

দিলেন। হনুমান তড়িৎ গতিতে লঙ্কায় পৌঁছে পর্বত রাখল। সুষেণ পর্বত থেকে বিষল্যকরণী সংগ্রহ করে লক্ষ্মণের শেল তুলে, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরল। উঠে বসলেন লক্ষ্মণ। বানরসেনারা উল্লাসে জয়ধ্বনি দিল।

লক্ষ্মণের প্রাণ সঞ্চার এবং সুস্থ হওয়ার পর জাম্ববান শ্রীরামকে বলল।

আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে এবার হনুমান গন্ধমাদনকে স্বস্থানে রেখে আসুক।

শ্রীরাম সম্মতি জানালে হনুমান আবার সেই গন্ধমাদনকে তুলে নিয়ে স্বস্থানে রাখার জন্য চলল। লঙ্কার প্রাসাদ থেকে রাবণ তা দেখে তার সেনাদলের বাদবাকি সাত প্রধান, বক্রমুখ, ওষ্ঠবক্র, প্রচণ্ডলোচন, তালভঙ্গ, সিংহমুখ, ঘোরদর্শন প্রমুখকে নির্দেশ দিল হনুমানকে বধ করার জন্য। এই সাত মায়াবী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আকাশ মার্গে হনুমানকে আক্রমণ করল। হনুমান হাতে নাড়াল না, পর্বত ফেলে দিল না শুধুমাত্র লেজকে প্রসারিত করে সাতজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আছাড় মারল। সেই প্রচণ্ড আছাড়ে কারও মস্তক চূর্ণ হলো, কারও হাত ভাঙ্গল, কারও পা, কারও বা সাড়া শরীরের হাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল। এবার নির্বিঘ্নে পর্বত যথাস্থানে রেখে হনুমান ফিরে এল।



বানরসেনাদের মধ্যে তখন উল্লাস। শ্রীরাম লক্ষ্মণও এইবার জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। এই সময় মিত্র বিভীষণের স্মরণ হলো। রাবণের এক মহাবলী পুত্র এখনও জীবিত। সেই মহীরাবণ বীরত্বে পিতার সমতুল্য, মায়াবী। রাবণ তাকে পাতালপুরীর অধিকার দিয়েছে। ইচ্ছামতো রূপ পরিবর্তন করে সে যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। এমনকী মায়াজাল রচনা করে সে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে হত্যা কিংবা অপহরণও করতে পারে। মহীরাবণের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভীষণ পক্ষীরূপ ধারণ করে রাবণের প্রাসাদে গিয়ে পিতা-পুত্রের গোপন মন্ত্রণা শুনে এসেছে। শিবিরে ফিরে শ্রীরাম-লূক্ষ্মণ সহ সকল বানর-বীরদের সঙ্গে আলোচনা করে চরম সতর্কতা অবলম্বন করল। বানর সেনাদের বলল—

—এই মায়াবী মহীরাবণের পাতাল প্রাসাদে মহামায়া বন্দি আছেন। সে যা ভাবে তাই করতে পারে। এই মহীরাবণের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান। এই মায়াবী দুষ্ট রাক্ষস এখন লঙ্কায়, তাই আজকের রাত সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

সকল বানরবীর বিভীষণের সঙ্গে সহমত হয়ে শ্রীরাম - লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। বীর হনুমান আপন পুচ্ছের বিস্তার ঘটিয়ে এক বিচিত্র গড় নির্মাণ করল। নিজ দ্বার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে অভ্যন্তরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে রাখা হলো। বাইরে সদা সতর্ক বানরবীরগণ প্রহরায়। সদা সতর্ক বিভীষণ শ্রীহনুমানকে সতর্ক করল যে মহীরাবণ বিভিন্ন রূপ ধরে গড়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, এমনকী সে হনুমানের পিতা পবনদেবের রূপ ধরেও আসতে পারে। কোনও অবস্থাতেই যেন তাকে গড়ে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া না হয়। সতর্ক হনুমান, আর বিভীষণ হনুমান রচিত সেই কৃত্রিম দুর্গের চারপাশে অনবরত সতর্ক দৃষ্টিতে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। হনুমানের অনুরোধে শ্রীরাম হনুমান রচিত দুর্গের উপরিভাগে সুদর্শন চক্রকে স্থাপন করেছেন। মায়াবী মহীরাবণ তখন সকলের অলক্ষ্যে বানর শিবিরে উপস্থিত হয়েছে। শিবিরের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখে সহজে কার্যসিদ্ধি হবে না অনুমান করে মায়ার আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামের পিতা দশরথের রূপ ধারণ করে হনুমান রচিত দুর্গদ্বারে এল এবং পিতার পরিচয় দিয়ে পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। সতর্ক হনুমান তাকে বিভীষণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। বিভীষণের নাম শুনে মায়াবী তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল।

বিভীষণ এসে এই কথা শুনে হনুমানকে আবার সতর্ক করে গড়ের চারপাশ দেখতে গেল। বিভীষণ চলে যেতেই মহীরাবণ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের রূপ ধরে এসে গড়ে প্রবেশ করতে চাইল। এবারও হনুমান তাকে বিভীষণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে সে পালিয়ে যায়। এরপর মহীরাবণ শ্রীরামের মাতা কৌশল্যা ও শ্বশুর জনকের বেশ ধরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বিভীষণ এসে পড়ায় পালিয়ে যায়। এইভাবে বার বার ব্যর্থ হয়ে মহীরাবণ এবার বিভীষণের রূপ ধরে হনুমানের সামনে আসে এবং গড়ের ভিতরের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রবেশ করে। অনতিবিলম্বে বিভীষণ বাইরে থেকে দুর্গদ্বারে এলে হনুমান বিস্মিত হয়। বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করে—

—তুমি এইমাত্র প্রভুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করলে। এখন দেখছি তুমি বাইরে থেকে এলে। আসল বিভীষণ কে?

বিভীষণ বুঝতে পারল যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাঁরই রূপ ধরে মহীরাবণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। হনুমানকে এই ইঙ্গিত দিয়ে বিভীষণ অতি দ্রুত গড়ে প্রবেশ করল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। মায়াবলে সকলকে অচৈতন্য করে মহীরাবণ সুড়ঙ্গ তৈরি করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে

গেছে।

এবারে হনুমান বিভীষণকে সন্দেহ করতে লাগল। ভাবল এ হয়তো বিভীষণের ষড়যন্ত্র। কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর হনুমানের ভুল ভাঙে। তখন দুজনে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে দেখে সব বানর সেনারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। শ্রীরাম- লক্ষ্মণ যথাস্থানে নেই। পাশে এক বিরাট সুড়ঙ্গ। তখন তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না যে মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করেছে। হনুমান আর বিভিষণের যত্নে একে একে বানরবীরেরা চৈতন্য লাভ করে। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বমান, নল, নীল প্রমুখ যোদ্ধা চৈতন্য লাভ করে সম্যক অবগত হয়ে রোদন করতে শুরু করে। প্রাজ্ঞ জাম্ববান সকলের উদ্দেশ্যে বলে—

—এই ঘোর বিপদে রোদন উচিত নয়। এই বিপত্তির সময়ে কেউ অস্থির হয়ো না। প্রভু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে পারে এমন শক্তি ত্রিভুবনে কারও নেই। রাজা সুগ্রীব, তুমি আমার মন্ত্রণা শোনো। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে তুমি মারুতিকে প্রেরণ কর। ত্রিজগতে মারুতির অগম্য কোনো স্থান নেই। শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন মারুতি অবশই তাঁদের সন্ধান পাবে।

জাম্ববানের বাক্য সমস্ত বা নরবীর একবাক্যে সমর্থন করলো। রাজা সুগ্রীব বলল—

—হে পবননন্দন! হনুমান হেলায় সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতামাতার সন্ধান করেছ। তুমি শ্রীরামের প্রধান ভক্ত একথা সর্বজনবিদিত। তোমার বুদ্ধিভ্রমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অপহৃত হয়েছেন। তুমিই তাঁদের অন্বেষণ কর।

সুগ্রীবের বচনে লজ্জায় অভিমানে মারুতির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—

—প্রভুর অন্বেষণে আমি অবশ্যই যাব।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে আমি তাঁদের নিয়ে আসব। আর যদি খুঁজে না পাই তবে এই জলধিতে আত্মবিসর্জন দেব। যতক্ষণ আমি তাঁদের সন্ধান নিয়ে ফিরে না আসি ততক্ষণ তোমরা এখানে একত্রিত হয়ে থাক।

সুগ্রীব ও জাম্ববানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান যে সুড়ঙ্গ পথে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে অপহরণ করা হয়েছে বলে সন্দেহ, সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে। দীর্ঘ সময়ে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এক সময়ে অনুমান পাতালপুরীতে প্রবেশ করে। পাতাল পুরীর মধ্যাকাশে তখন সূর্যের প্রকাশ। দৃষ্টিনন্দন বিচিত্র হর্ম্যরাজি। প্রথমেই বলীরাজার প্রাসাদ। তার পাশ দিয়ে পাতাল গঙ্গা ভোগবতী প্রবাহিতা। স্থানে স্থানে মুনিঋষিদের সমাবেশ। বিস্তৃত রাজপথে চলেছে যক্ষ-যক্ষিণী, নাগ-নাগিনীর দল। এই পুরীতে জরা-মৃত্যু নেই, নেই রোগ শোক। হনুমান ছদ্মবেশে ঘুরছে কত তপোবন, কত তীর্থস্থান, অতিথি নিবাস কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেল না। অবশেষে হনুমান পৌঁছে গেল পাতাল লঙ্কায় মহীরাবণের পুরীতে। এই পুরী অমরাবতী তুল্য। অতিক্ষুদ্র বানরের রূপ ধারণ করে হনুমান এই পুরীতে প্রবেশ করল। সুবর্ণ নির্মিত বিচিত্র প্রাসাদ, পাষাণবেষ্টিত কত দীঘি সরোবর। পুণ্যার্থী, বিদ্যার্থী, স্নানার্থীর মেলা, কিন্তু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথায়? হনুমান তখন সেই ক্ষুদ্র বানরের রূপে এক বৃক্ষে আরোহণ করে বসে রইল। সেখান থেকে হনুমান সব দেখছে সব শুনছে। আর হনুমানকেও সবাই দেখছে, কারণ ইতিপূর্বে পাতালপুরীতে এহেন বানর কেউ দেখেনি। সবাই দেখছে আর ভাবছে এই মর্কট কোথা থেকে এল? এইবার এক অতিবৃদ্ধার নজরে এল হনুমান। তার শনের মতো চুল, কুঁচকে যাওয়া চামড়া। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর, আর স্মৃতি অম্লান। এই মর্কটকে দেখে বৃদ্ধা চমৎকৃত হলো, তার এক পূর্বকথা স্মরণ হলো। বৃদ্ধা তখন এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে সেই গোপন কথা বলতে শুরু করল। —''ওলো শোন, আমি আজ আমাদের এই পাতাল লঙ্কায় এক মহাবিপদের আভাস পাচ্ছি। সে অনেকদিন আগের কথা। আমাদের রাজা মহীরাবণ অমর হওয়ার জন্য বহুদিন মহামায়ার কঠোর তপস্যা করল। অবশেষে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী মহামায়া জাগ্রত হয়ে মহীকে বর দিতে চাইলেন। রাজা মহীরাবণ তখন মহামায়ার কাছে অমরত্বের বর প্রার্থনা করলেন। দেবী বললেন—অমরত্ব ছাড়া অন্য কোনো বর চাও।

তখন চতুর মহীরাবণ দেবীকে বলল—

—দেবী আমাকে এই বর দাও যেন দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ, শ্বাপদ কিংবা সর্পের হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।

দেবী তাকে সেই বর দিলেন। বর দিয়ে দেবী অন্তর্ধান করলেন। মহীরাবণ ভাবল বাকি রইল নর আর বানর। এই দুই আমার ভক্ষ্য, ওরা আমার কী করবে? দেবী কিন্তু অন্তর্ধানের আগে দৈববাণীতে বলে গিয়েছিলেন যে এই নর-বানরের হাতে মহারাজা সবংশে সংহার হবে।" ক্রমে বেলা বাড়ছে পুরনারীরা দলে দলে কলসী কাঁখে দীঘি সরোবরে জল নিতে আসছে। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। এক পুরবাসিনী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল—

—দাইমা! রাজপ্রসাদে আজ কীসের উৎসব? বাদ্য বাজছে, মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, বহুলোকের আনাগোনা।

বৃদ্ধা বলল—

—শোন্, কথাটা পাঁচকান করিস না। আজ রাজার মন্দিরে মহামায়ার কাছে নরবলি হবে। রাজা কোথা থেকে অনিন্দ্যসুন্দর দুই যুবাকে ধরে এনেছে। আর দু'চার দণ্ড তারপর তাদের বলি হবে। রাজবাড়ির গোপন কথা তোদের বলে ফেললাম কথাটা। গোপন রাখিস কথাটা। রাজা দুই নরকে ধরে এনেছে, আবার এক বানর কোথা থেকে এসে জুটেছে। পূর্বকথা স্মরণ করে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।

বৃক্ষের উপর বসে হনুমান সব কথা শুনল। শ্রীরাম-লক্ষণ

যে রাজপ্রাসাদের কোনও গোপন কক্ষে বন্দি আছেন তাতে তার আর কোনও সন্দেহ রইল না। কালবিলম্ব না করে সকলের অলক্ষ্যে হনুমান প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরল হনুমান। কিন্তু কোথাও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সন্ধান পেল না। হঠাৎ তার নজর এল এক প্রাসাদ ঘিরে অস্ত্রধারী নিশাচরদের সমাবেশ। হনুমানের কৌতূহল হলো। এই ক্ষুদ্র প্রাসাদ ঘিরে এত নিরাপত্তা কেন? মক্ষিকার রূপ ধারণ করে হনুমান প্রবেশ করল সেই প্রাসাদে। এই কক্ষ, সেই কপক্ষ ঘুরে এক সুরক্ষিত কক্ষে দেখতে পেল নিদ্রিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে। মায়ার প্রভাবে এখনো তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। মক্ষিকারূপে শ্রীহনুমান অলিন্দপথে কক্ষে প্রবেশ করে আপন শরীর ধারণ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে জাগ্রত করল। নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীরাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন—মিত্র সুগ্রীব ও বিভীষণ কোথায়?

হনুমান বলল—

—প্রভু! মহাবিপদ ঘটে গেছে, আমার পুচ্ছনির্মিত গড় থেকে কৌশলে মহীরাবণ আপনাদের হরণ করে পাতালে নিয়ে এসেছে। আমি তারই নির্মিত সুড়ঙ্গপথে পাতালপুরীতে এসে অনেক অনুসন্ধানের পর আপনাদের সন্ধান পেয়েছি।

এই সময় বাইরে দামামা বাজিয়ে ঘোষণা হলো—

আজ মহামায়ার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। প্রচুর ছাগ ও মহিষ বলি হবে সেই সঙ্গে দু'টি যুবা নর।

এই ঘোষণা শুনে সন্ত্রস্ত শ্রীরাম হনুমানকে বললেন—

পবননন্দন! আমরা মহাবিপদে আছি। সৈন্য নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, পাতালের বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো কীভাবে?

হনুমান তখন করজোড়ে বললেন—

প্রভু, আপনার শ্রীচরণের দাস আছে। অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বৃক্ষ ও প্রস্তর দিয়ে আজ শত্রু নিপাত করবো। রাবণ রাজার বংশের যে যেখানে আছে আপনার কৃপায় একে একে সবাইকে শমন ভবনে পাঠাবো। রাক্ষস বধের জন্য এবার আপনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার মহিমার কথা এই দুষ্ট জানে না। মৃত্যুকে আহ্বান করার জন্য দুষ্ট মহীরাবণ আপনাদের এখানে এনেছে। এই প্রাসাদের মন্দিরে দেবী মহামায়া প্রতিষ্ঠিতা, আমি গোপনে সেই দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। যদি মহামায়া এই দুষ্ট রাক্ষসের হিত করতে চায় তবে মন্দির সহ তাঁকে সমুদ্রে ডোবাব। আমি মহামায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসছি। আমার কাল বিলম্ব হবে না। আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুতি মক্ষিকার রূপ ধারণ করে মহামায়ার মন্দিরে পৌঁছে গেল। মক্ষিকারূপে মন্দিরে প্রবেশ করে হনুমান মহামায়ার কানে কানে বলতে থাকে—

—হে জগৎজননী, তোমার কাছে বলি দেবার জন্য মহীরাবণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে হরণ করে এনেছে। আজ দ্বিপ্রহরে তাদের বলি হবে। তুমি কি মহীরাবণকে এই আজ্ঞা দিয়েছ? যদি দিয়ে থাক তবে তোমার সামনে আমি মহীরাবণকে সবংশে বধ করব। আর তোমাকে মন্দির-সহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

হনুমানের বচন শুনে স্মিতহাস্যে দেবী বললেন—

শ্রীরামের আগমনে এই পাতালপুরী পবিত্র হয়েছে। মহীরাবণ মহাপাপী, সর্বদা দেব, দ্বিজ, ধর্ম হিংসা করে এই মায়াবী রাক্ষসের উৎপীড়নে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ। এই দুরাত্মা রাক্ষসদের সংহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতার রূপে এসেছেন। নির্বোধ মহারাবণ নিজের বিনাশের জন্য সাক্ষাৎ শমনকে আহ্বান করেছে। শুদ্ধাত্মা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলির নিমিত্ত এই মন্দিরে আনায়ন করা হবে। তুমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে গোপনে এই কটি কথা বলবে। আমার সম্মুখে বলির আগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে এনে প্রণাম করতে বলবে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন বলে যে তারা রাজপুত্র প্রণাম করতে জানে না। শ্রীরাম মহীরাবণকে বলবে যে কী করে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দেবার জন্য। মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁট মুণ্ডে প্রণাম করবে। তখন তুমি এই খড়্গ নিয়ে মহীরাবণের ধর-মুণ্ড আলাদা করবে। মহামায়ার এই বাক্য শোনার পর হনুমান আবার গোপনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে দেবীর এই বার্তা জ্ঞাপন করে।

যথাসময়ে অনুচরগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে স্নান করিয়ে মহামায়ার মন্দিরে নিয়ে আসে। মহীরাবণ পূজা শেষ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করতে বলে। উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—

আমরা রাজপুত্র। প্রণাম করতে জানি না। তুমি দেখিয়ে দিলে করতে পারি।

তখন মহীরাবণ অষ্টাঙ্গে হেঁটমুণ্ডে মহামার সামনে প্রণাম করে। সঙ্গে সঙ্গে হনুমান নিজমূর্তি ধারণ করে খড়্গ দ্বারা মহীরাবণের শিরশ্ছেদ করে। দেবলোকে জয়ধ্বনি ওঠে। মহীর অনুচররা ত্রাসে পলায়ন করে অন্তঃপুরে এই দুঃসংবাদ দেয়। সংবাদ গেল মহীরাবণের স্ত্রীর কাছে। অসুরনন্দিনী মহাতেজবতী দিব্য তির-ধনুক নিয়ে নর বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল। দেবী মহামায়ার প্রতিও রানি ক্ষুব্ধ। যে মহীরাবণ এতদিন ভক্তিভরে দেবীপূজা করে এসেছে আজ দেবী সেই ভক্ত মহীরাবণকে বলিরূপে গ্রহণ করলেন। সেই দেবীরও আজ বিসর্জন দেবে অসুরনন্দিনী মহীরাবণের রানি। মন্দিরে হনুমানকে দেখে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে থাকে রানি। হনুমান তখন এক বৃক্ষ উৎপাটিত করে সেই বাণ প্রতিহত করে। ততক্ষণে পাতালপুরীর রাক্ষস বাহিনী এসে রানির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়। হনুমান বৃক্ষ ও পাথর নিক্ষেপ করে সেই সেনাদের বিধ্বস্ত করে। রানি দশমাসের অন্তঃসত্ত্বা তথাপি হনুমান রাম-লক্ষ্মণের

উপর অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করে চলেছে। হনুমান বৃক্ষদ্বারা সেই তির প্রতিহত করতে করতে এক সময়ে রানির উদরে প্রচণ্ড পদাঘাত করে। সেই পদাঘাতে রানির পেট থেকে বেরিয়ে মহীরাবণের পুত্র হনুমানের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করে। হনুমান কৌশলে তার পা দুটি ধরে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ডে ছুঁড়ে মারে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। রানিকেও হনুমান যমালয়ে পাঠায়। এবার দেবী মহামায়াকে মুক্ত করে শ্রীরাম- লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হনুমান সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আবার বানর শিবিরে ফিরে আসে। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান, নল, নীল প্রমুখ বীরের সঙ্গে মিলিত হন। বানর শিবিরে শ্রীরামের সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের জয়ধ্বনিতে লঙ্কা প্রকম্পিত হয়। মহীরাবণের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদে রাবণের শেষ আশাও নিভে গেল।

রাবণ কিন্তু দমার পাত্র নয়। আবার নতুন করে সৈন্যসজ্জা করল দশানন। এবার মন্দোদরী রাবণকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু রাবণ অনড়। শ্রীরামচন্দ্রও তার অজেয় ধনুহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে। আট অশ্বে টানা বিচিত্র রথে আরোহণ করে রাবণ রাম-লক্ষ্মণ ও বানর সেনাদের উপর অবিরাম বাণবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন ভূমিতে দাঁড়িয়ে। ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্র সারথি মাতলী-সহ তাঁর দিব্য রথ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রেরণ করলেন। আর পাঠালেন এক দিব্য মুকুট। বার্তা পাঠালেন রাবণকে মেরে দেবতাদের হিতসাধন করার জন্য। রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের রথ দেখে রাবণ দেবতাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে। ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণ রামের উপর নাগপাশ বাণ নিক্ষেপ করে গরুড় বাণে শ্রীরাম রাবণের বাণ নিবৃত্ত করে। রাবণের আক্রমণ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। শ্রীরামচন্দ্র সেই আক্রমণ প্রতিহত করে প্রতি আক্রমণে রাবণকে জর্জরিত করে।

শ্রীরামচন্দ্র এবার উপলব্ধি করলেন দৈবী সহায়তা ছাড়া রাবণকে বধ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দেবী চণ্ডীকার শরণ নিয়ে তার পূজা করলেন কিন্তু দেবী তাকে দর্শন দিলেন না। এবার মিত্র বিভীষণের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র একশত আট নীলপদ্ম দিয়ে দেবীপূজার সংকল্প করলেন। পৃথিবীর মধ্যে নীলপদ্ম পাওয়া যায় একমাত্র দেবীদহে যা লঙ্কা থেকে দশ বছরের পথ। সংকটমোচন হনুমান একদিনের মধ্যে সেই দশবছরের পথ অতিক্রম করে একশত আট পদ্ম নিয়ে এল। এবার সমুদ্রতীরে ঘট স্থাপন করে শুদ্ধচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র একশ আট শত সংখ্যক নীলপদ্ম দানের সংকল্প করে দেবীর পূজা আরম্ভ করেন।

কিন্তু পদ্ম প্রদানের সময় একটি পদ্ম কম পড়ে। কোথাও পদ্ম খুঁজে না পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র আপন চক্ষু উৎপাটিত করে একশত আট পদ্ম পূরণ করার উদ্দেশ্যে ধনুর্বাণ নিয়ে চক্ষু উৎপাটিত করার জন্য উদ্যত হলে দেবী স্বমূর্তিতে আবির্ভূতা হন এবং পূজা গ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনিই গোলকাধিপতি নারায়ণ এবং সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। রাক্ষসকুল নিধনের জন্য রাবণ সীতা হরণ করেছে। রাবণ বধ শুধু সময়ের অপেক্ষা এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন।

এদিকে রাবণের হিত কামনায় তার আদেশে স্বয়ং বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠে রত। চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য হনুমান চণ্ডীর দুটি অক্ষর তুলে নেয় মক্ষিকার বেশে। অভ্যাসবশত বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটে না। তখন হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে চণ্ডী গ্রন্থ কেড়ে নেয়। বৃহস্পতির পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। দেবী চণ্ডী তখন রাবণকে পরিত্যাগ করে কৈলাশে স্বস্থানে চলে যান। রাবণ কিন্তু তখনও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিভীষণ তখন শ্রীরামকে বলল, রাবণকে বধ করা অসম্ভব। তার দেহ যদি খণ্ড খণ্ডও করা হয় তা আবার জুড়ে যাবে এমনই ব্রহ্মার বর। তার মৃত্যু সম্ভব একমাত্র ব্রহ্মা প্রদত্ত মৃত্যুবাণ দ্বারা। যে বাণ রানি মন্দোদরীর কাছে গোপনে সযত্নে রক্ষিত আছে। রাবণ তখন রণক্ষেত্রে। হনুমান সেই সময়ে বৃদ্ধ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন রাবণের প্রাসাদের অন্দর মহলে মন্দোদরীর কক্ষে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে মন্দোদরী ভক্তিভরে আসন পেতে দিয়ে বসাল। হনুমান বলল—

—মাত! আমি বৃদ্ধ জ্যোতিষী। রাবণের চির হিতৈষী। রাবণের এখন খুব বিপদ। কিন্তু তার মৃত্যু ভয় নেই।

মন্দোদরী আশ্বস্ত হয়ে বলল। আপনি সঠিক বলছেন তো ব্রাহ্মণ?

আমার স্বামীর জীবনহানি ঘটবে না তো? হনুমান বলল—

—কী করে ঘটবে মা? একমাত্র ব্রহ্মাপ্রদত্ত সেই মৃত্যুবাণ ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রে রাবণের মৃত্যু হবে না।

অবাক হয়ে গেল রানি মন্দোদরী। যে মৃত্যুবাণের কথা রাবণ ও রানি ছাড়া অন্য কেউ জানে না এই জ্যোতিষী জানল কী করে। এর গণনা নিশ্চয় অব্যর্থ। জ্যোতিষীর প্রতি রানি মন্দোদরীর ভক্তি বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে গেল। বলল—হে বিপ্র, আমার স্বামীর অন্য কোনো বিপদ ঘটবে নাতো?

হনুমান বলল—

—বিপদ আসবে, তবে লঙ্কেশ্বর তা অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারবে। তুমি শুধু সেই মৃত্যুবাণটা সুরক্ষিত রাখবে। আচ্ছা, সেই বাণটা কোথায় রেখেছ বলো আমি সেখানে একটা রক্ষাকবচ দিয়ে যাই। যাতে সেই বাণ আরও সুরক্ষিত থাকে

সরল বিশ্বাসে মন্দোদরী বলল—

ব্রাহ্মণ তুমি লঙ্কেশ্বরের হিতৈষী তাই বলছি, যে কথা অন্য কেউ জানে না। সেই মৃত্যুবাণ ওই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর সুরক্ষিত আছে।

তৎক্ষণাৎ হনুমান স্বমূর্তি ধারণ করে এক প্রচণ্ড পদাঘাতে সেই স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙে বাণটি হস্তগত করল। তারপর নিমেষের মধ্যে প্রাসাদ ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল।

মন্দোদরী আর্তনাদ করছে। ছুটে এল সেবিকা সহচরীর দল। সেই মৃত্যুবাণ ততক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে পৌঁছে গেছে। রাবণ তখন মহাকোপে বাণবৃষ্টি করে চলেছে। সারথি মাতলি বাণে বাণে অস্থির। বাণে বাণ নিবারণ করছেন শ্রীরামচন্দ্র। এইবার শ্রীরাম সেই মৃত্যুবাণ ধনুকে জুড়লেন। সুবর্ণরচিত এই বাণ, বাণের মুখ গুপ্তভাবে অগ্নির অধিষ্ঠান, মধ্যভাগে শিব, অলক্ষিতে বাণের উপর যমের অধিষ্ঠান। এই বাণকে চালনা করে ঊনপঞ্চাশ বায়ু। বাণের গর্জনে ত্রিভুবন কম্পমান। বাণের মুখ থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, মন্ত্রপাঠ করে গুরু বিশ্বামিত্রকে স্মরণ করে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের নাভিদেশ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিন হয়ে সেই বাণ রাবণের নাভিদেশ বিদ্ধ করে। রাবণ ছটফট করে রথ থেকে ভূমিতলে পড়ে যায়। কিন্তু রাবণের মৃত্যু সম্পর্কে সবাই এমনকী দেবতারাও সন্দিহান। রাবণ বহুবার মৃতুমুখে পতিত হয়ে আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে। যমদূত, বিষ্ণুদূত সবাই এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এগোচ্ছে না কেউ। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পাঠালেন সুদক্ষরাজা রাবণের কাছ থেকে কিছু রাজনীতি শিক্ষার জন্য। কারণ দুই ভাই চোদ্দ বছর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাজনীতি শিক্ষা হয়নি। দেশে ফিরে সিংহাসনে বসতে হবে রাজ্যশাসন করতে হবে। লক্ষ্মণকে দেখে মুমূর্ষু রাবণের পূর্বস্মৃতি ফিরে এল। ভক্তিভাব জাগল মনে। নিজে অপারগ তাই শ্রীরামকে আহ্বান করল শেষ সময়ে তার পদধূলি নেওয়ার জন্য। লক্ষ্মণের মুখে সংবাদ পেয়ে শ্রীরাম এসে দাঁড়ালেন রাবণের সামনে। রাবণ বলল—

—প্রভু, তোমার সঙ্গে বৈরিতা, যুদ্ধ ও মৃত্যু আমার ভবিতব্য, আমার মুক্তি।

রাবণ তখন হাত বাড়িয়ে শ্রীরামের পদধূলি নিয়ে মাথায় দিল। বলল—প্রভু, তুমি রাজপুত্র, দেশে ফিরে রাজা হবে। প্রজা শাসন করবে। মনে রাখবে কোনো শুভকর্ম পরে করবে বলে ফেলে রাখবে না। শুভ কাজ শীঘ্রই করবে—শুভস্য শীঘ্রম্।

বলতে বলতে রাবণের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। শ্রীরামের শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে ত্রিভুবনজয়ী দশানন রাবণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। দেবতারা অন্তরীক্ষে জয়ধ্বনি করল। বিভীষণ, মন্দোদরীসহ রাক্ষসকুলের রোদনধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিষাদিত হলো।

রাবণের মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ। যার জন্য এত কাণ্ড সেই সীতা কিন্তু এই সংবাদ এখনো জানে না। তাই সীতাকে এই সংবাদ দিতে হনুমানকে পাঠান হলো। লঙ্কার রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে হনুমান। আজ ভয় নেই, হিংসা নেই, উৎকণ্ঠা নেয়। হনুমানকে দেখে আজ রাক্ষসরা প্রণাম করছে। কেউ আবার ভয়ে পালাচ্ছে। অশোককাননে সীতার সামনে উপস্থিত হলো হনুমান। সীতাকে প্রণাম করে রাবণের মৃত্যু সংবাদ শোনাল। জানাল প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এই সংবাদ সীতাকে দেবার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। রাবণের মৃত্যুসংবাদ শুনে সীতা আনন্দ সাগরে ভাসলেন। বললেন—

পবন নন্দন, তুমি আজ যে সংবাদ আমাকে দিলে তার বিনিময়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করতে পারি এমন সম্পদ আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আমি যে পরিমাণ ঋণী তোমাকে এক অখণ্ড রাজ্যের অধিকারী করলেও সেই ঋণ শোধ হবে না।

হনুমান বলল—রাজ্য ধনে আমার প্রবৃত্তি নেই। তোমার শ্রীচরণ আমার সব থেকে বড়ো সম্পদ। তবে তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাবণের যে চেড়ীরা এতদিন তোমার উপর অত্যাচার করেছে, দুর্ব্যবহার করেছে তাদের আমি যন্ত্রণা দিয়ে মারব।

হনুমানের কথা শুনে সব চেড়ীরা ভীত হয়ে সীতার চরণে পতিত হলো। বলল—

সীতাঠাকুরানি, হনুমান আমাদের প্রাণ নেবে। তুমি আমাদের রক্ষা কর।

সীতা তখন হনুমানকে বললেন—বৎস হনুমান। তুমি বিচারে পণ্ডিত, ভেবে দেখ আমি যে দুঃখ কষ্ট অপমান সহ্য করেছি তা আমার অদৃষ্টের লিখন। তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হয়েও কেন ওদের মেরে স্ত্রীবধের ভাগী হবে? এই চেড়ীরা যতদিন রাবণের অধীন ছিল রাবণের আদেশে তারা আমার উপর নির্যাতন করত। রাবণ সবংশে মরার পর এরা এখন আমার সেবা করছে।

সীতার আদেশে হনুমান চেড়ীদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকল। সীতা আবার বলল।

—হনুমান, তুমি শ্রীরামকে বলবে এগার মাস এই অশোক বনে চেড়ীদের নির্যাতন সহ অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছি শুধু এই দিনটির অপেক্ষায়। আমার দুঃখের কি অবসান হয়েছে? কবে আমি আবার শ্রীরামের চরণে ঠাঁই পাব?

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে শিবিরে গিয়ে শ্রীরামের কাছে সব কথা জানাল। শ্রীরাম তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে পাঠাল সীতাকে নিয়ে আসার জন্য। বিভীষণ সরমা সুবর্ণ দোলা নিয়ে অশোকবনে গিয়ে সসম্মানে সীতাকে শ্রীরামের কাছে নিয়ে এল। লক্ষ্মণ বললেন—

হে অগ্রজ, শত্রু নিপাত হয়েছে। চলো আমরা মিত্র বিভীষণের সঙ্গে লঙ্কায় থেকে যাই। লঙ্কায় বিভীষণ কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব, হনুমান। সুখে থাক অযোধ্যবাসী।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—তা হয় না লক্ষ্মণ ''জননী জন্মভূমিশ্চ



স্বর্গাদপী গরীয়সী।”

শুরু হলো অযোধ্যায় ফেরার প্রস্তুতি। বিভীষণকে লঙ্কার রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হলো বৈদিক নিয়ম মেনে আর্যরীতি অনুসারে। সুগ্রীব বানরসেনাদের আদেশ দিল সেতু পেরিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে। দেবলোক থেকে এল বিচিত্র পুষ্পক বিমান। সেই বিমানে আরোহণ করলেন শ্রীরাম সীতা আর লক্ষ্মণ। সরমা চোখের জলে বিদায় দিল সীতাকে। সমুদ্র লঙ্ঘন করে সবাই উপস্থিত সেতুমূলে। সেতু পেরিয়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। বিভীষণ, সুগ্রীব, নল, নীল প্রাজ্ঞ জাম্বমান। সর্বাগ্রে হনুমান।

সীতা বললেন—

—প্রভু, কার্য সাধনের জন্য সমুদ্র বন্ধন করেছ। এখন কার্য শেষ সমুদ্রকে বন্ধনমুক্ত কর। আর এই সেতু থাকলে রাক্ষসরা ভারতভূমিতে এসে উৎপাত করবে। পাতাল থেকে সমুদ্র দেবতা উঠে এসে করজোড়ে শ্রীরামের কাছে বন্ধন মুক্তি প্রার্থনা জানাল। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে বাণাঘাতে সেতু ভেঙে দিলেন।

শ্রীরামের বাসনা এখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা দিয়ে দেশে ফিরবেন। হনুমানকে পাঠান হলো কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসার জন্য। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে হনুমান শিবলিঙ্গ নিয়ে আসছে না। পূজার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীরাম সহস্তে এক শিবলিঙ্গ তৈরি করলেন বালি দিয়ে, পূজা করলেন সেই লিঙ্গের। এই সময় হনুমান কৈলাশ থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হলো। হনুমানের সম্মানার্থে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের আনা সেই লিঙ্গ ও প্রতিষ্ঠিত এবং পূজা করেন। সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত সেই শিবের নাম

হলো রামেশ্বর।

দেবগণ প্রেরিত সেই পুষ্পকরথে বহুজন আরোহণ করতে পারে। শ্রীরাম-সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান, নল, নীল সহ অনেক বানরবীর সেই রথের আরোহী। পথে যেতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা মুনিকে সম্ভাষণ করা। শ্রীরামের ইচ্ছা অনুযায়ী রথ সেখানে নামল। শ্রীরামচন্দ্র মুনির পাদপদ্ম বন্দনা করলেন। মুনি আশীর্বাদ করে বসার জন্য উত্তম আসন দিলেন। শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ উপবেশন করলেন। বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, নল, নীল, জাম্ববান তপোবনের শোভা দর্শন করতে লাগলেন। শ্রীরাম মুনির কাছ থেকে অযোধ্যার সংবাদ জানলেন। ভরতের সংবাদ নিতে গিয়ে জানলেন ভরত নন্দীগ্রামে অবস্থান করছেন এবং রাজ্যভোগ না করে ঋষির মতো জীবন যাপন করছেন। সিংহাসনের উপর রেশমের বস্ত্র পেতে শ্রীরামের পাদুকা স্থাপন করে নীচে কৃষ্ণসার চর্মের উপর বসে বশিষ্ঠ নারদের পরামর্শে রাজকর্ম পরিচালনা করছেন। ভরত গৃহে ফেরার সময় সেই পাদুকার কাছে অনুমতি নিয়ে তবে গৃহে ফেরেন। মুনির মুখে ভরতের এহেন ভ্রাতৃভক্তির কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিত হলেন, দ্রুত ভরতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর মন আকুলিত হল।

ভরদ্বাজের অনুরোধে শ্রীরাম একরাত্রি সপার্শ্বদ তাঁর আশ্রমে অবস্থান করলেন। ভরদ্বাজ বললেন—

—মুনিগণ কঠোর তপস্যায়ও যাঁর দর্শন পান না সেই মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র আজ তাঁর আশ্রমের অতিথি। তাঁর সঙ্গী স্বয়ং লক্ষ্মী ও শেষনাগ। রুদ্রাবতার হনুমান।

তপোবনে মুনিবর শ্রীরামচন্দ্র পার্ষদবর্গ এবং বানর সেনাদের জন্য যথোপযুক্ত আহার্য ও পানীয়ের আয়োজন করলেন। রজনী প্রভাত হলে শ্রীরাম হনুমানকে বললেন—

—পবননন্দন! তোমাকে এখন দুটি কাজ করতে হবে।

হনুমান বলল—

—আদেশ করেন প্রভু।

—আমার অনুজ ভরত বর্তমানে নন্দীগ্রামে অবস্থান করছে। তাকে আমার আগমন সংবাদ জানিয়ে বলবে অনতিবিলম্বে অযোধ্যায় ফিরে যেতে। আর নন্দীগ্রামে যাওয়ার পথে শৃঙ্গবেরপুরে চণ্ডালরাজ্যে গিয়ে আমার পরম মিত্র গুহককে জানাবে আমি তার দর্শন প্রার্থী।

আজ্ঞা পেয়ে হনুমান তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। চক্ষুর নিমেষে পৌঁছে গেল শৃঙ্গবেরপুরে চণ্ডাল রাজ্যে। মনুষ্য রূপ ধরে রাজা গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন সংবাদ এবং শ্রীরাম যে তার দর্শনাভিলাষী সেই সংবাদও জানাল। সংবাদ পাওয়া মাত্র গুহক মিত্র সম্ভাষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাচার সংগ্রহ করে চণ্ডাল কটক সহ মিত্র সম্ভাষণে অগ্রসর হলো। নৃত্য করতে করতে চলেছে চণ্ডালের দল। পথে সাক্ষাৎ হলো শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে। অনেক দূর থেকে গুহককে দেখে শ্রীরাম রথ থেকে নেমে গুহককে আলিঙ্গন করলেন। চারদিকে শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি।

বীর হনুমান তখন চলেছে নন্দীগ্রামে ভরতের উদ্দেশে। অনেক গ্রাম-নগর নদ-নদী পেরিয়ে অবশেষে ভরতের আবাস। অন্তরীক্ষ থেকে হনুমান দেখছে মঠ, মন্দির, পান্থশালা, দীঘি সরোবরে সুসজ্জিত, চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত এই নগর যেন দেবভূমি। মধ্যখানে প্রাসাদ, ন্যায়ালয়। সেখানে সিংহাসনে বিচিত্র রেশমের বস্ত্রের উপর শ্রীরামের পাদুকা স্থাপন করে নীচে কৃষ্ণাজিনে বসে আছেন এক দীপ্ত যুবা। অনুমানে ভরতকে চিনতে পারল মারুতি। তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে ভরতের সামনে গিয়ে আত্মপরিচয় দিল হনুমান।

আমি পবননন্দন হনুমান। পূর্বেও আমাদের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের দাস আমি। বহুপুণ্যফলে আজ তোমার দর্শন পেলাম। সমস্ত বিত্ত বৈভব ছেড়ে তোমার যোগীর আচরণ, তপস্বীর বেশ। রাজা হয়েও তুমি রাজ্যভোগী নও। যার প্রতীক্ষায় তুমি এই সুকঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করছ, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বার্তা দিয়ে তোমার কাছে পাঠালেন। তিনি মাতা সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গতকাল রাত্রিবাস করে অদ্য অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন। প্রভুর ইচ্ছা এই যাত্রায় তুমিও প্রভুর সঙ্গে থাক।

এই বার্তা শুনে ভরত আনন্দে হনুমানকে আলিঙ্গন করে এবং অনেক মহার্ঘ উপহারে ভূষিত করতে থাকে। তখন হনুমান বলল—

ভরত! দান কিংবা উপহারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্রভু শ্রীরামের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা।

হনুমানের এহেন বাক্যে ভরত অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আহ্বান করে সমস্ত বার্তা জানিয়ে যাত্রার আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে শত্রুঘ্ন ও হনুমান সহ শ্রীরামের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই আকাশ মার্গে দেখা গেল সেই হংসচালিত শ্রীরামচন্দ্রের বিমান। ভরত, শত্রুঘ্ন হনুনাকে দেখে শ্রীরামের আদেশে বিমান নেমে এল তাদের সামনে। দীর্ঘদিন কৃচ্ছসাধনের ফলে ভরতের শক্তি নেই রথে আরোহণ করার। হনুমান তাকে কোলে করে রথে তুলেন। দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর চার ভ্রাতার মিলন হলো। সবাই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসলেন।

আবার রথ চলল আকাশমার্গে। নীচে বানরসেনাদের

আনন্দোল্লাস কোলাহল। অদূরে অযোধ্যার দেবালয় আর প্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বানরদের মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। রথ এসে অবতরণ করল অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে। রথ থেকে একে একে নেমে এলেন শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে জননী জন্মভূমির পদধূলি নিয়ে মস্তকে ধারণ করলেন। উচ্চারণ করলেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' তারপর সবাই একে একে প্রণাম করলেন গুরু, মাতৃমণ্ডলী এবং অন্যান্য গুরুজনদের। বহুদিন পরে অযোধ্যানগরী আনন্দের জোয়ারে ভাসল।

রাজ প্রতিনিধি ভরত, শত্রুঘ্ন, রাজমাতা কৌশল্যা বিশেষ করে কৈকেয়ী আর বিলম্ব করতে রাজি নন। রাজগুরু বশিষ্ঠদেবকে বললেন অতি দ্রুত শ্রীরামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে। পরদিন শুভক্ষণ পাওয়া গেল। তাই পরদিনই অভিষেক। সাতশত নদীর জল আনার দায়িত্ব নিল সুগ্রীব। সাতশত সুবর্ণ কলসী নিয়ে বানরকটক নিয়ে চলল সাতশত নদীর জল আনার জন্য। আর একা হনুমান চলল সমুদ্রের জল আনতে। যথা সময়ে সমুদ্র আর সাত শত নদীর জল নিয়ে উপস্থিত বানর কটকেরা। মধুমাসে শুক্লপক্ষে পূনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হলো।

কিন্নর-কিন্নরী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীদের মধুর নৃত্যগীতে মুখরিত হল অযোধ্যাপুরী। প্রজারা আনন্দের জোয়ারে ভাসল। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষণা করলেন আজ থেকে অযোধ্যা নগরী রক্ষার ভার থাকবে হনুমানের উপর। নগরীর মধ্যে নির্মিত হবে হনুমানের পুরী 'হনুমানগড়ি'। নর-বানর এক সঙ্গে হনুমানের জয়ধ্বনি দিল।

একই সঙ্গে অভিষেক হলো লঙ্কেশ্বর বিভীষণ এবং কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবের। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকে যোগ দিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে এলেন মুনি ঋষিরা। দেবতারা নানা অলঙ্কারে শ্রীরামচন্দ্রকে ভূষিত করলেন। ব্রাহ্মণদের ভূমি গ্রাম দিয়ে তুষ্ট করলেন। অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে বসলেন শ্রীরামচন্দ্র কোনো প্রার্থী বিমুখ হলো না। শ্রীরামের গলার স্বর্ণপদ্ম মালা খুলে পরানো হলো সুগ্রীবের গলায়। অঙ্গদকেও অপূর্ব ভূষণে ভূষিত করলেন। সমস্ত বানরসেনা উপহারে ভূষিত হলো। একমাত্র কোনো উপহার না পেয়ে অভিমানে নীরব হল হনুমান। বাক্‌রুদ্ধ হনুমান ভাবছে প্রভু সবাইকে তুষ্ট করলেন কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করলেন কেন? সীতামাতা এতক্ষণ কাউকে কোনো উপহার দেননি, এবার নিজের কণ্ঠহার খুলে হাতে নিলেন। শ্রীরামের মুখে এবার স্নিগ্ধ হাসি। হনুমানকে ইশারায় ডাকলেন সীতা দেবী। ছুটে এল হনুমান, সেই অমূল্য রত্নহার সীতা হনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন। হার পেয়ে হনুমান সীতার চরণে প্রণাম করে। সীতা বললেন—

—হে সংকটমোচন। যতকাল পৃথিবী থাকবে ততকাল তুমিও রোগ শোকহীন হয়ে জীবিত থাকবে। যতকাল শ্রীরামনাম পৃথিবীতে ঘোষিত হবে, ততকাল তুমিও অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে, এই বর তোমায় দিলাম।

হনুমান রত্নহারটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখল তারপর হারটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দিল। সভার লোকজন অবাক হয়ে গেল হনুমানের কাণ্ড দেখে। লক্ষ্মণ কূপিত হয়ে বললেন—

—মারুতির গলায় এই রত্নহার দেওয়াই ভুল হয়েছে। বানরজাতি এই রত্নহারের মূল্য কী বুঝবে?

শ্রীরাম ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন। এর বৃত্তান্ত হনুমানই ভালো জানে তাকে জিজ্ঞাসা কর?

হনুমান বলল—

—বহুমূল্য ভেবে এই হার আমি গ্রহণ করেছিলাম। বিচার করে দেখলাম এই হারে শ্রীরাম নাম নেই। শ্রীরামনাম হীন ধন পরিত্যাগ করাই ভালো।

লক্ষ্মণ বললেন—

—হে পবননন্দন হনুমান। তোমার দেহেওতো রামনাম কোথাও দেখছি না। তবে কেন মিথ্য এই দেহ ধারণ করে আছ? এই কলেবর ত্যাগ কর।

এই কথা শুনে ক্ষুব্ধ হনুমান আপন নখের দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করল। সবাই অবাক হয়ে দেখল অস্থিময় লক্ষ লক্ষ রামনাম লেখা।



Shree Cement

SHREE
जंग रोधक
CEMENT

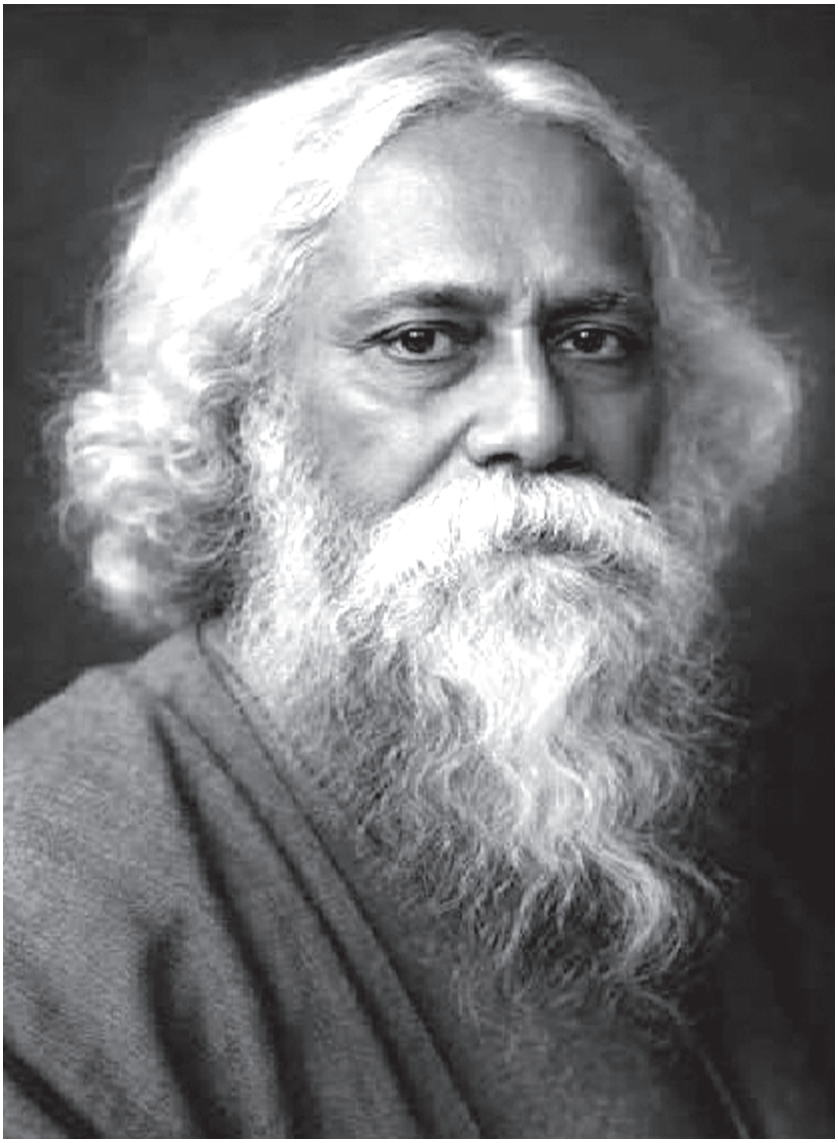
घर की ढाल,
सालों साल



Delhi Corporate & Marketing Office: Epitome, Building 5, 9th Floor, DLF Cyber City, Block-B, Gurugram - 122002.
Tel: +91-124-4699200

Kolkata Corporate Office: 21, Strand Road, Kolkata - 700001. | Tel: +91-33-2230 9601-04

www.shreecement.com



রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা

মানবমুক্তির এক মহাকাব্য

আশিস গিরি

ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁদের জীবন ও কর্ম কেবল তাঁদের সময়কে নয়, পরবর্তী বহু প্রজন্মকেও প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে। তিনি শুধু কবি নন, শুধু সাহিত্যিক নন, শুধু শিক্ষাবিদ বা দার্শনিকও নন; তিনি ছিলেন ভারতীয় আত্মার এক আধুনিক চিন্তাবিদ। তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষাচিন্তা, সমাজভাবনা ও বিশ্বমানবতা, সবকিছুর গভীরে প্রবাহিত হয়েছে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক চেতনা, যার উৎস ভারতীয় উপনিষদ।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রের নামমাত্র ছিল না; এটি ছিল মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের পথ, জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাখ্যা এবং স্বাধীনতার এক গভীর দর্শন। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্যে উপনিষদের ‘একত্ব’, ‘আনন্দ’, ‘মুক্তি’ এবং ‘বিশ্বচেতনা’-র ধারণা নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণেই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ইতিহাস কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়; এটি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদপ্রসূত মানবমুক্তির দর্শনের বাস্তব রূপ।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে উপনিষদের স্থান অনন্য। বেদসংহিতার আচারভিত্তিক ধর্মচিন্তার পর উপনিষদ মানুষের মনকে বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতের দিকে নিয়ে যায়। উপনিষদের মূল প্রশ্ন— আমি কে? বিশ্ব কী? মানুষ ও বিশ্বজগতের সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে উপনিষদ আবিষ্কার করে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য।

‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই।

‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম।

এই ঘোষণাগুলি শুধু ধর্মীয় বাক্য নয়—এগুলি মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা

ও অসীম সম্ভাবনার ঘোষণা।

উপনিষদ মানুষকে ভয় থেকে মুক্ত করে। সেখানে কোনো সংকীর্ণতা নেই, কোনো লিঙ্গগত অহংকার নেই, কোনো সংকীর্ণ গোঁড়ামি নেই। আছে মুক্ত বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-উপলব্ধির সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ এই উপনিষদীয় চেতনাকে আধুনিক যুগে নতুন ভাষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মমতের অন্যতম প্রধান নেতা এবং উপনিষদের নিবেদিত পাঠক। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র ছিল উপনিষদ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করতে হবে।

ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে উপনিষদের মন্ত্র শুনেছেন। হিমালয় ভ্রমণে পিতার সঙ্গে কাটানো সময় তাঁর মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন যে উপনিষদের মন্ত্র তাঁর কাছে কেবল ধর্মীয় বাণী নয়—এগুলি হলো বিশ্বজগৎকে নতুনভাবে দেখার জানালা।

উপনিষদ তাঁকে শিখিয়েছিল, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ মানুষের থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। এই উপলব্ধিই পরবর্তীকালে তাঁর মানবতার ভিত্তি হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা মূলত প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল পরীক্ষার।

রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই শিক্ষা মানুষের কল্পনাশক্তিকে হত্যা করে। শিশুর মনকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যান্ত্রিক করে তোলে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ''বিদ্যালয় যেন খাঁচা, আর ছাত্র যেন খাঁচার পাখি।''

এই তীব্র অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর বিকল্প শিক্ষাচিন্তার জন্ম। তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেখানে, জ্ঞান আনন্দময় হবে, প্রকৃতি শিক্ষার অংশ হবে, শিল্প ও সাহিত্য পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে থাকবে, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক হবে মানবিক, শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের উপায় হবে।

এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী হলো প্রকৃতির কোলে এক শিক্ষাতীর্থ। ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্মচার্যশ্রম। এই বিদ্যালয়ের মূল ধারণা ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমশিক্ষার আধুনিক রূপ। গাছতলায় ক্লাস, খোলা আকাশের নীচে পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, শ্রমের মর্যাদা, সব মিলিয়ে এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানে 'Experiential Learning' বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার যে ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে, শান্তিনিকেতন তার অগ্রদূত।

উপনিষদের অন্যতম মূল শিক্ষা হলো ঐক্য। বিশ্বজগতের সবকিছু এক মহাসত্তার অংশ। রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কাছে গাছ, নদী, আকাশ, পাখি, সবই ছিল জীবন্ত। এই কারণেই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনও পটভূমি না হয়ে থেকে চরিত্র হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেছেন, আবার মানুষের আত্মীয়তাও খুঁজে পেয়েছেন। আজকের পরিবেশ সংকটের যুগে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ তিনি মানুষকে কখনোই প্রকৃতির প্রভু হিসেবে দেখেননি বরং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে, ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'' আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছুর জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাছে আনন্দ মানে কেবলমাত্র ভোগ নয়। আনন্দ মানে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলন। তাই তিনি লিখেছেন, ''আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।''

এই আনন্দ ব্যক্তিগত সুখের সীমা ছাড়িয়ে এক মহাজাগতিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতবিতান সবখানেই এই আনন্দতত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ছিল বেদনায় পূর্ণ। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, কন্যা রেণুকা, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, একাধিক প্রিয়জনকে তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই শোক তাঁকে ধ্বংস করেনি। উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শিখিয়েছিল যে মৃত্যু সমাপ্তি নয়, জীবন বৃহত্তর এক সত্তার অংশ।

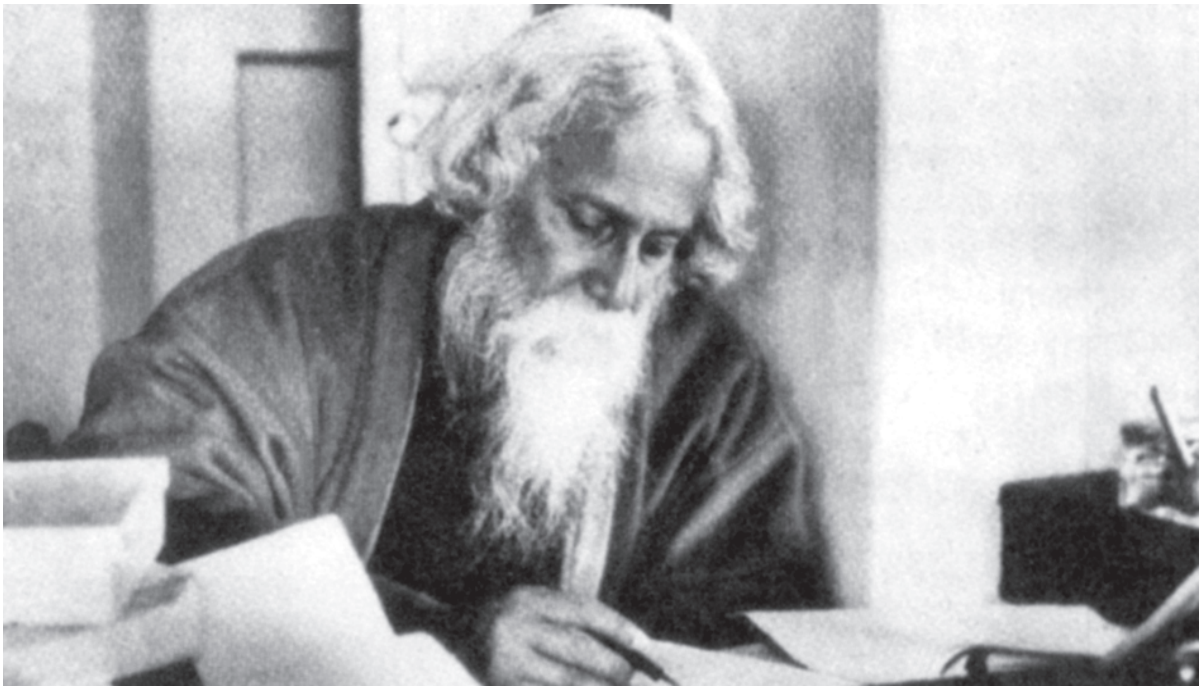
এই কারণেই তাঁর শোক কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে, আর কাব্য মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়েছে। গীতাঞ্জলির গভীর আধ্যাত্মিকতা এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

শিল্প, সঙ্গীত ও মুক্তির সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প বিলাসিতা ছিল না। এটি ছিল আত্মবিকাশের পথ। উপনিষদে সত্য, শিব ও সুন্দরকে একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে তিনি দেখেছেন। এই কারণেই শান্তিনিকেতনে শিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক সবকিছুই মানুষের সংবেদনশীলতা গড়ে তোলার মাধ্যম। ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান তাই অনন্য।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা : দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার সন্ধান শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে আরও বৃহত্তর স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল একটি বিদ্যালয় গড়ে তুললেই তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হবে না। তিনি এমন একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে পৃথিবীর নানা সংস্কৃতি, ভাষা, দর্শন ও জ্ঞানধারা মিলিত হবে। এই স্বপ্ন থেকেই ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর মূলমন্ত্র ছিল, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'।

অর্থাৎ, 'যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক নীড়ে পরিণত হয়।' এই মন্ত্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদীয় চেতনার গভীরতম প্রকাশ নিহিত।



উপনিষদ মানুষকে বিভাজনের বদলে ঐক্যের শিক্ষা দেয়। সেখানে মানুষকে কোনো বিশেষ সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা হয় না। বরং মানুষকে দেখা হয় বিশ্বসত্তার অংশ হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আধুনিক সভ্যতার অন্যতম সংকট হলো বিচ্ছিন্নতা। মানুষ লিঙ্গভেদে বিভক্ত, ধর্মে বিভক্ত, অর্থনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত। এই বিভাজন মানবসভ্যতাকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি বিশ্বভারতীর মাধ্যমে এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে সংস্কৃতির সংঘর্ষের পরিবর্তে, সংলাপ হবে; আধিপত্যের বদলে, আদান-প্রদান থাকবে। এই ভাবনা ছিল তাঁর সময়ের তুলনায় অনন্য প্রগতিশীল।

'সাধনা' গ্রন্থে উপনিষদীয় দর্শনের ব্যাখ্যা অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা বোঝার জন্য তাঁর ইংরেজি বক্তৃতাসংকলন Sadhana- The Realisation of Life বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে উপনিষদের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানত প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভারতীয় দর্শন প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

তিনি লিখেছিলেন যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার স্বার্থপর সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তার প্রকৃত পরিচয় বৃহত্তর বিশ্বমানবতার মধ্যে নিহিত। এই চিন্তা উপনিষদের সেই বাণীরই আধুনিক ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বাণীর অর্থ ছিল, মানুষে মানুষে বিভেদ শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম। মানবজাতির গভীরে রয়েছে এক অভিন্ন চেতনা। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কেবল কাব্যগ্রন্থ নয়; এটি এক আধ্যাত্মিক যাত্রার দলিল।

এখানে কবি বারবার সীমিত সত্তা থেকে অসীমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনের যে সাধনার কথা বলা হয়েছে, গীতাঞ্জলিতে তা কাব্যের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কবির ঈশ্বর কোনো অলৌকিক সিংহাসনে আসীন নন।

তিনি মানুষের শ্রমে, দুঃখে, প্রেমে, আনন্দে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে উপস্থিত। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ।" এখানে ঈশ্বর মন্দিরের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এটি উপনিষদের সর্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্বের এক আধুনিক মানবতার রূপ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার প্রধান বিষয় ছিল, শুধুমাত্র আচার পালনে কিছু হবে না, উপলব্ধি করতে হবে। উপনিষদও একই শিক্ষা দেয়। সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তরের মাধ্যমে; কেবল আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। এই কারণেই শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে কোনো মূর্তি ছিল না। সেখানে আলো, নীরবতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এক সর্বজনীন আধ্যাত্মিকতার চর্চা করা হতো।

জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেশপ্রেমিক, কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তার সমর্থক ছিলেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছিল যে উগ্র ন্যাশনালিজম মানবসভ্যতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতামালা Nationalism-এ তিনি এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানবতার ঊর্ধ্বে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনেও উপনিষদের বিশ্বমানবতার আদর্শ কাজ

করেছে। উপনিষদ মানুষকে সীমিত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষাকে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের সৃজনশীল সংলাপের মাধ্যমে তিনি বিশেষত্ব স্থাপন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো অবদান হলো তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি কখনো অন্ধ জাতীয়তার সমর্থক হননি। আবার পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণও করেননি।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সভ্যতার বিকাশ ঘটে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে। এই কারণে বিশ্বভারতীতে চীনা, জাপানি, পারস্য, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জ্ঞানধারার সমন্বিত অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

চীনা ভবন, হিন্দি ভবন, বিদ্যা ভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আদর্শের বাস্তব রূপ। এটি ছিল এক ধরনের বৌদ্ধিক বিশ্বায়ন, যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সম্মান। শ্রীনিকেতন স্থাপনা ছিল মানবমুক্তির এক সামাজিক প্রকল্প। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উন্নতি দিয়ে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারতের প্রাণ গ্রামে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল—কৃষির উন্নয়ন, গ্রামীণ শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা। স্বাস্থ্যসেবা ও কারুশিল্পের প্রসার এবং সমবায় আন্দোলন। এখানে উপনিষদের মানবমুক্তির ধারণা সামাজিক রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি ছিল না; অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে ছিল।

রবীন্দ্রনাথের উৎসব পালনের দর্শন মহামিলনের তত্ত্ব। জীবন ও প্রকৃতির মিলন। শান্তিনিকেতনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল উৎসব।

পৌষমেলা, বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব। এসব কেবল অনুষ্ঠান ছিল না। এসব ছিল শিক্ষার অংশ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, উৎসব মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করে। উপনিষদের আনন্দতত্ত্ব এখানে জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এবং শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক পরিবেশচেতনা আজকের প্রধান আলোচ্য। আজ পৃথিবী পরিবেশ সংকটে আক্রান্ত। জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, এসব মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু আগে এই বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে কেবল সম্পদ হিসেবে দেখেননি। তিনি প্রকৃতিকে আত্মীয় হিসেবে দেখেছিলেন।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই অর্থে তিনি আধুনিক পরিবেশদর্শনের একজন অগ্রদূত।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও নন্দনতত্ত্বও ছিল অনন্য চিন্তার ফসল। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মুক্তি দেখেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য কোনো বিলাসিতার বস্তু নয়। এটি মানুষের আত্মবিকাশের অপরিহার্য্য উপাদান।

উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ধারণা তাঁর শিল্পচিন্তার ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, সৌন্দর্য মানুষের আত্মাকে প্রসারিত করে। সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে। এই কারণেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলাকে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শান্তিনিকেতনের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের আনন্দের চেয়ে সাফল্যের চাপে বেশি আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে। আজ বিশ্বজুড়ে যে ধারণাগুলি গুরুত্ব পাচ্ছে সেগুলি হলো, Holistic Education– Experiential Learning– Environmental Education– Liberal Arts Interdisciplinary Studies.

এসবের বীজ রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই রোপণ করেছিলেন। উপনিষদীয় মুক্তির ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের গভীরে। উপনিষদে মুক্তি মানে কেবল মৃত্যুর পরের অবস্থা নয়। মুক্তি মানে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া। সংকীর্ণতা থেকে অসীমের দিকে যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে মানবিক ও সামাজিক অর্থ দিয়েছেন। তাঁর কাছে মুক্তি মানে, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে' ভয় থেকে মুক্তি, অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্তি, অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি, বিভাজন থেকে মুক্তি।

এই কারণেই তাঁর বিখ্যাত প্রার্থনা, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' ছিল, উপনিষদীয় মুক্তিরই আধুনিক কাব্যিক রূপ।

রবীন্দ্রনাথ কেন আজও প্রাসঙ্গিক তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা কোনো অতীতমুখী দর্শন নয়। এটি ভবিষ্যতের দর্শন। তিনি এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, শিক্ষা হবে মুক্তির পথ, সংস্কৃতি হবে সংলাপের মাধ্যম এবং মানবতা হবে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ।

আজকের পৃথিবীতে যখন যুদ্ধ, বিভাজন, পরিবেশ সংকট ও সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মানুষ কেবল অর্থনৈতিক সত্তা নয়; সে সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও। শান্তিনিকেতন তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি এক জীবন্ত দর্শন। বিশ্বভারতী কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; এটি বিশ্বমানবতার এক অনন্ত আহ্বান।

আর রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন কবি নন; তিনি ভারতীয় উপনিষদীয় চেতনার আধুনিকতম ব্যাখ্যাকারী ক্রান্তদর্শী, যিনি মানুষের মধ্যে অসীমের সন্ধান করেছিলেন এবং সেই সন্ধানকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবমুক্তির এক মহাকাব্যে রূপ দিয়েছিলেন।

তাঁর এই উত্তরাধিকার যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে। কারণ উপনিষদের মতোই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখান, মানবতাই মানুষের চূড়ান্ত পরিচয়। □



শকুন্তলা

মৌ চৌধুরী

ঘুমের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে জেগে উঠল পূর্বা। বুকের মাঝে চাপচাপ ভাব একটু যেন শ্বাসকষ্ট আর বাঁ দিকের কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের দিকটাতে ব্যথা ভাব। কান মাথা গরম হয়ে উঠছে। মাথাটা একটু টলোমলো করছে। আধো ঘুম চোখে ও বুঝতে পারছে না রাত কত হবে। পুরো ঘরজুড়ে তার একক জীবনের মতোই অন্ধকার।

হঠাৎ করে এভাবে ঘুম ভাঙার কারণে প্রথম দিকে কিছুটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল পূর্বা। তারপর মানসিক জড়তা কিছুটা কাটিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে ঘরের অল্প আলোতে শরীরে অস্বস্তি নিয়েই বাথরুমে গেল। নিজের মনেই একবার ভাবল অনেকটা জীবন তো একাই কাটিয়ে দিল। এখন ভয় পেলে চলবে কেন। চোখে মুখে জল দিতে দিতে ভাবল গতরাতে শুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল কয়েকটা তেলেভাজা খেয়েছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত ছাড়িয়ে যাওয়ার বয়েসে এসে এখন অনেক ঘটনা, অনেক কথা, পুরনো দিনের কত বিষয়, কত স্মৃতি ভাবলে মনের ভেতর গভীর প্রভাব ফেলে। খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়। বেশ কিছুদিন থেকে এই অনুভূতিটা হচ্ছে, পুরনো দিনের কথা মনে পড়া। সেই ছোট্টবেলার হারিয়ে আসা দিন থেকে জীবন মরণ লড়াই করে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে ওকে। একে একে সব কিছুই জীবন্ত জলছবি হয়ে হয়ে বুকে জমা হয়ে আছে। সেইগুলোই যেন ফুটে উঠছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় বসল পূর্বা। হঠাৎই মনে পড়ল একবার এক সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন,যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে বা ক্ষতি করার চেষ্টা করে তার নিজের ক্ষতি একশোগুণ বেশি হয়। কাজেই কখনই কারও ক্ষতি করতে নেই। বরং অন্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলে নিজের সুখ বাড়ে। কথাগুলো খুব মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে ওর।

পূর্বা তো জেনেবুঝে সুযোগ পেলেই অকারণে অন্যের ক্ষতি করে এসেছে। অন্যের অনিষ্টতে নিজের প্রাপ্তি শূন্য হলেও তার অসুখী জীবন, না পাওয়া জীবনের প্রতিশোধ যেন এভাবেই নিতে চেয়েছে। যেন নিজে সুখ পায়নি তাই অন্যের সুখ তার কাছে অসহনীয়। পূর্বা এখন এই নির্জন রাত গভীরে একাকী কিছুটা অসুস্থ শরীর নিয়ে আবারও ভাবতে থাকে এ কেমন মানসিক দ্বন্দ্ব, মানসিক যন্ত্রণা তার।

কত বন্ধু আত্মীয় স্বজনের প্রতিবেশীর সহকর্মীর অনিষ্ট করেছে তার হিসাব নিজের কাছে নেই। খুব পরিকল্পনা করে নিষ্ঠুর মন নিয়ে অপরের ক্ষতি করেছে। অথচ যাদের ক্ষতি ও করেছে তারা প্রায় সবাই ওকে বিশ্বাস করেছিল, আস্থা রেখেছিল। কেউ ভাবতেই পারত না মিষ্টি ও আন্তরিক আচরণের এই মেয়েটির কাছ থেকে এত বড় আঘাত আসতে পারে। তবে ও সেভাবে কাউকে আর্থিক প্রতারণা করে নিজের ব্যাগ ভর্তি করেছে এমনটা নয়। মিথ্যে অভিনয় করে অনেকের সংসার ভেঙেছে, প্রেমের সম্পর্ক নষ্ট করেছে, প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধুদের ভেতর বিরোধ বাঁধিয়ে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করছে। অথচ প্রায় কেউ ওর ভূমিকা বুঝতেই পারেনি। মাঝেমাঝে কখনও পূর্বার মনে হয় কেন ও এমন করে। কখনও ভাবে আস্ত একটা শয়তান ওকে বশ করেছে। সেই শয়তানটা ও নিজে। সেই কারণেই হয়ত ওর ভেতর কোনও অনুশোচনা নেই। নিজেই ভাবে এ কেমন মানসিকতা ওর। নিজেকে শুধরে ফিরিয়ে আনে না বরং এরপর কার কীভাবে অকল্যাণ করবে সেই কথাই ভাবে। হয়তো পরিকল্পনাও করে।

পূর্বার চেহারা একটা সময় বেশ সুন্দর ছিল। বয়েসের ছাপ এলেও সেই সৌন্দর্য এখনও অনেকটাই আছে। চোখে মুখে কোমলতার ছাপ, খুব গুছিয়ে ধীরে ধীরে বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে। পরকে ভালোবাসার অভিনয়টা ভালোই করে। প্রায় সবাই তাড়াতাড়ি ওকে বিশ্বাস করে ফেলে, আস্থা রাখে।

পূর্বা যৌবনের প্রারম্ভে একবার নিজেও ঠকে গিয়েছিল প্রতারণার ফাঁদে পড়েছিল। তারপর থেকে যেন সে আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিল। সত্যিকারের ভালোবাসাগুলোকে বুঝতেই পারেনি। স্বর্গের মাতৃস্নেহহীন অপ্সরা যেমন তাদের সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর দায়হীন হয়ে ফেলে রাখত। সন্তানদের প্রতি কোনও স্নেহবন্ধন কাজ করে না। অনেকটা যেন পূর্বার জীবনের সঙ্গে তার মিল আছে। অপ্সরা মেনকা তার সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে গাছের তলায় ফেলে রেখেছিল। আকাশে উড়ন্ত পাখিরা সেই শিশুকে দেখে নেমে এসে পাখা বিস্তার করে রক্ষা করেছিল। পরে ঋষি কন্ব ও ঋষিপত্নী গৌতমী তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করেছিল। নাম রেখেছিল শকুন্তলা। ঠিক একই ভাবে মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা পূর্বা অনাদরে মামারবাড়িতে বেড়ে উঠেছিল। পূর্বা ওর দিদার কাছে শকুন্তলার গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনেই প্রশ্ন করত, নিজের মা বাবা ছাড়া সে কীভাবে বড় হলো।

মা বাবার আদর স্নেহ মমতা কী পূর্বার জানা তো দূরের কথা, সারা জীবনে কতবার তাদের দেখেছে বলে দিতে পারে। ওর মা ছোটখাট একটা সরকারি চাকরি করত। আর বাবার ছিল মাঝারি মাপের ব্যবসা। তাদের দু'জনকেই কাজের পেছনেই সময় অনেক দিতে হতো। সারাদিনের ক্লান্তিতে শিশু পূর্বাকে দেখার সময়ই ছিল না। শিশু পূর্বার যত্ন হবে তাই ভেবে ওকে মামারবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিদা খুশি মনেই ওকে বুকে নিয়েছিল। দুই মামাই স্নেহপূর্ণ আদর দিয়েছিল। কিন্তু দুই মামি প্রথম



থেকেই তাকে অবাঞ্ছিত করে রেখেছিল।

পূর্বাকে বোঝানো হয়েছিল একটু বড় হলেই ওকে মা বাবা কাছে নিয়ে যাবে। মা বাবার জন্য মন হাহাকারের ভেতরেই জানল ওর একটা ভাই হয়েছে। দুই ছেলে-মেয়েকে দেখাশোনা করা সম্ভব নয় তাই পূর্বাকে মামার বাড়িতেই থাকতে হবে। একটু বড় হতেই বুঝতে পারল অনাদর অবহেলার মধ্যেই ওকে দিন কাটাতে হবে। মামার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ওর তফাত মামিরা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। বাড়ির সব কাজ সেরে স্কুলে যেতে হয়েছে। অনেকদিন ঠিক মতো খাবার জোটেনি। সারাদিনের কাজের পরিশ্রমে সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে পড়লে রাতের খাবার জুটত না। কেবল রাতে কেন, বহু দিন না খেয়েই কাটাতে হয়েছে।

ওর প্রায় সমবয়সি মামাতো বোন তৃণার সঙ্গে একটা সুক্ষ্ম লড়াই চলেছে জীবনভর। তৃণা কথায় কথায় পূর্বার নামে তার মাকে মিথ্যে নালিশ জানাত। চুলের মুঠি ধরে মারত। পড়ার বই ছিঁড়ে ফেলত। যদিও সবটা না জেনেই মামি পূর্বার নামেই মামার কান ভারী করত। এরজন্য বকা মার জুটেছে ওর কপালে। অনাদরে অবহেলায় মা-বাবার ওপর অভিমানে চোখের জল নিজে থেকেই গড়িয়ে আসত পূর্বার। সব মিলিয়ে না পাওয়ার হতাশা, অনাদর, অর্ধাহার ক্রমেই হিংস্র করে তুলছিল পূর্বাকে। একদিন ফাঁক পেয়ে তৃণাকে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মেরেছিল। আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। জিঘাংসার প্রতিরূপ মনে হয় সেইদিন থেকে শুরু ওর জীবনে। খেলার মাঠে একা পেয়ে প্রথমে তৃণাকে লাথি দেখায়, থাপ্পর দেখায়। তৃণা রেগে গিয়ে পূর্বাকে মারতে থাকে এমনই সুযোগ খুঁজছিল ও। তারপর মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মার মারে তৃণাকে। দূর থেকে অন্য বন্ধুরা ছুটে আসার আগেই তৃণা ইচ্ছা করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। সবাই দেখতে পায় তৃণা পূর্বার বুকের ওপর চেপে বসে কিল চড় ঘুষি মেরেই চলেছে। পূর্বা কোনও প্রতিরোধ করছে না কেবলই কাঁদছে। সকলের চোখে ধরা পড়ে পূর্বা বিনা কারণে মার খাচ্ছে। সেদিন সকলেই তৃণাকে দোষারোপ করেছিল। তবে বড়মামি বিশ্বাস করতে চায়নি। মামিদের প্ররোচনায় পূর্বাকে ওর মায়ের কাছে রেখে আসে মামা। দিদাও আর রোজকার অশান্তি নিয়ে পেরে উঠছিল না।

দোষ করেও মিথ্যে অভিনয় করে কী করে পার পাওয়া যায় সেই ঘটনা থেকেই শিখতে শুরু করেছিল পূর্বা। বাড়িতে এসেও খুব ভালো ছিল তা নয়। এখানে ভাইকে নিয়ে মা-বাবা ব্যস্ত। ভাইয়ের আদর বেশি। ভাইকে দেখাশোনা আর বাড়িতে কাজের জন্য পারিচারিকা রাখা হয়েছিল। রাগে হিংসায় পূর্বা সুযোগ পেলেই ভাইয়ের জন্য রাখা দুধ খেয়ে নিত, রান্নায় লঙ্কা নুন বেশি দিয়ে দিত। ভাইকে চিমটি দেওয়া, মারা তো ছিলই। অফিস থেকে এসে মা সব শুনে পূর্বাকে একচোট মারত, রাগারাগি করত। এরপর

বাবা এলে আরেক প্রস্থ মারধোর চলত। পূর্বাকে নিয়ে অশান্তি চলতই। বাবা প্রায়ই পূর্বাকে শুনিয়ে মাকে বলত এই জঞ্জাল আপদটাকে ঘরে না আনলে এত অশান্তি হতোই না। কোন ঘরে জন্ম কে জানে। মা কাঁদতে কাঁদতে বলত তখন কি আর জানতাম। পূর্বা মনে আঘাত পেয়েছিল এসব শুনে।

কিছুটা বড় হওয়ার পর পূর্বা বুঝতে পারল ওর মা, বাবা, ভাইয়ের সঙ্গে চেহারার মিল যেন খুঁজে পাচ্ছে না। মায়ের কথা শুনে ওর ভাবনা এসেছিল পূর্বা কি তাদের সন্তান নয়? কুড়িয়ে পাওয়া নাকি কোনও জায়গা থেকে আনা? ভাইয়ের প্রতি আক্রোশ বেড়েই চলছিল। সুযোগ বুঝে একদিন ভাইকে খুব মেরেছিল, চোখের নীচে আঁচেড় দিয়েছিল। সেইদিন মা ওকে খুব মেরেছিল। ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। একটিও কথা বলেনি পূর্বা, চোখে জলও আসেনি। সেই ছোট্ট জীবনে এত কঠোর আগে হয়নি পূর্বা।

সব শুনে ছোট মাসি পূর্বাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। মাসির কোনও সন্তান ছিল না। মাসি মেসো দুজনেই চাকরি করত হাসপাতালে। বাড়িতে মেসোর বয়স্ক মা-বাবা ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন মাসির এক কিছুটা বয়স্ক অবিবাহিতা ননদ। তিনি সকালে একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন। বেলায় ফিরে এসে সংসারের অনেক কাজই সামলে দিতেন। পূর্বাকে খুবই ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু পূর্বার মাথায় যে কী খেয়াল চাপল মাসির বাড়িতে এসেও কাউকে শান্তিতে থাকতে দিতে চাইত না। জুতো লুকিয়ে ফেলা, মাসির ননদের পেন বই সরিয়ে ফেলা। মাসির শ্বশুরের ওষুধ লুকিয়ে ফেলা। খাবারে নুন মিশিয়ে দেওয়া। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারত না কে এমন কাজ করছে। সবাই বাড়িতে থাকলে পূর্বা নিজের মনে চুপচাপ মলিন মুখ করে বসে থাকত। ক্লাসের বই খুলে পড়ত। ওর নিষ্পাপ সরল মুখ দেখে কেউ ধরতেই পারেনি এসব ওর কাজ।

এই নিষ্পাপ মুখ ছিল পূর্বার অনন্য বৈশিষ্ট্য। ওর প্রতিহিংসায় আসক্ত মন হলেও লেখাপড়ায় কিছুটা মেধা ছিল। আর শ্যামবর্ণা হলেও দিনদিন আকর্ষণীয়া হয়ে উঠছিল। ওর ভুবনমোহিনী হাসি দিয়েই সবাইকে মাত করে রেখেছিল। সব মিলিয়ে সহজেই সকলের মন জয় করে নেওয়ার দক্ষতা ছিল ওর। স্কুলে থাকতেই কত জনের বই খাতা অন্যের ব্যাগে রেখে, মিথ্যে নালিশ করে টিচারদের হাতে মার খাইয়েছে।

বাড়ির শাসনকে না মানা, ইচ্ছে মতো চলাফেরা করা সব মিলিয়ে বাঁধনছাড়া হয়ে উঠেছিল পূর্বা। তাই অনিবার্যভাবেই অল্প বয়েস থেকে বিভিন্ন বয়সি ছেলেদের কাছে ও হয়ে উঠেছিল মোহের টান। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়লেও কোনও প্রেমই সিরিয়াস ছিল না। মাঝখান থেকে কারণে অকারণে পল্লবিত হয়ে ওর বদনাম ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু পাড়ারই ছেলে রগচটা বাপীকে কেন পূর্বা সত্যিকারের ভালোবেসেছিল তার কোনও কারণ জীবনের উপান্তে এসেও বুঝতে পারে না। বয়েসের অনেকটাই ফারাক ছিল দুজনের। ছোটখাট একটা চাকরি করত বাপী। পূর্বার মাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই বাপী একরকম জোর করেই ওকে বিয়ে করে বসল। পূর্বার মা-বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনেকটা যেন আপদ বিদেয় হওয়ার মতো। বিয়ের পর নিজেকে পূর্বা বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুর্বাশামুনির অভিশাপ যার ওপর পড়ে সে কি চাইলেই বাইরে থেকে ঘরে মন ফেরাতে পারে? পূর্বাকে ওর শ্বশুরবাড়ির কেউ পছন্দ করত না। যে মেয়ে ঘরের কোনও শিষ্টাচার মানেনি, পারিবারিক বন্ধন শেখেনি সে কী করে মাথায় ঘোমটা দেবে, ঘরে শাড়ি পড়বে, রান্নাঘরের কাজ করতে পারবে। এই নিয়ে প্রতিনিয়ত শাশুড়ির মুখ ঝামটা, শ্বশুরের অসন্তোষ লেগেই থাকত। বাপী তার মা বাবার কথা শুনে পূর্বাকে গালাগালি করা গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে। ওর বিয়ের এক বছরের ভেতর শ্বশুর ক্যানসারে মারা যায়। সবাই সাব্যস্ত করে পূর্বা অলক্ষ্মী, রাক্ষসী তাই বাপী তার বাবাকে হারিয়েছে। বাপীর হুকুম ছিল তার মায়ের কথামতো সব চলতে হবে। ঘরের সব কাজের দায়িত্ব পূর্বার ওপর থাকবে। বাপী কখনও তার মাকে নিয়ে বাইরে গেলে পূর্বাকে ঘরে তালা আটকে রেখে যেত। বারকয়েক বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রথম দিকে ঝগড়া,জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি, চিৎকার করা শুরু করেছিল পূর্বা। তাতে খুব বেশি লাভ হয়নি। ছোটবেলা থেকেই না পাওয়ার হতাশায় রাগ ক্ষোভ জেদ এবারে তীব্র আকার নিতে শুরু করেছিল। এরপর বাপী ওর মাকে নিয়ে বাইরে গেলে পূর্বা নিজের হাত কোনও ভাবে বেঁধে, গায়ে কালি মেখে জানালা দিয়ে রাস্তার মানুষজন আর প্রতিবেশীদের ডেকে দেখাত ওর ওপর কতটা অত্যাচার চলছে। কারও দুঃখ বেদনা অনেকেই সমব্যথী হয় আবার অনেকেই মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে আনন্দ পায়। পূর্বার ওপর অত্যাচার করা হয় প্রচার পেতেই বাপী আর ওর মায়ের ওপর সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যাদের সঙ্গে বাপীদের সম্পর্ক ভালো নয় অনেক সময় ইচ্ছে করে পূর্বা তাদের বাড়ি ছুটে যেত। বলত বাপী আর ওর মায়ের হাতে মারের হাত থেকে রক্ষা পেতে ছুটে এসেছে। দু'দিন কিছু খেতে দেয়নি। কথাগুলো আগুনের মতো ছড়িয়েছিল। এই নিয়ে থানা পুলিশ পর্যন্ত হয়। পুলিশ বাপী আর ওর মাকে ধরে নিয়ে যায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগে। এই সময় বাপী লিখিত মুচলেকা দিতে



চেয়েছিল, আর কোনও দিন পূর্বার ওপর অত্যাচার করা হবে না। কিন্তু পূর্বা শোনেনি। অবশেষে অনেক টাকা ও গয়না ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাপী ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়। অনেকদিন জেলে থাকার জন্য বাপীর চাকরিটাও চলে যায়। পূর্বা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেই টাকা সমেত ডিভোর্সটা পেয়েছিল। ও জানত নইলে খালি হাতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হতো।

হাতে টাকা থাকায় অনেকটাই বল ভরসা ছিল পূর্বার। এই টাকার জন্যই হয়ত বাবা ঘরে জায়গা দিয়েছিল। এই সময় কিছুদিন বিউটি পার্লারে কাজ শিখেছিল। রোজগার ভালোই ছিল। ছোট একটা ঘর ভাড়া করে বাবার বাড়ি থেকে চলে আসে। পূর্বার চটকদার চেহারা, দুঃখী জীবনের গল্প, একা থাকা সব মিলিয়ে নানা বয়সি পুরুষ ওর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। কিন্তু ফের কাউকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার গড়তে চায়নি।

তবে তাদের ভেতর সানিকে কিছুটা ভালো লেগেছিল পূর্বার। যদিও প্রেমের সম্পর্ক গড়তে দেয়নি পূর্বা। কিন্তু সানি ছিল ওর জন্য পাগল। সানি ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। ওর বাবা আর কাকার একসঙ্গে ব্যবসা ছিল। যৌথ পরিবার। সানি আর ওর খুড়তুতো ভাই আনন্দ ছিল বাবা কাকা, মা আর কাকিমার নয়নের মনি। সানি নিজেদের ব্যবসার সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিল, আবার একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করত। বেশ সচ্ছল পরিবার। পূর্বার সঙ্গে পরিচয়ের পর ওকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সানি। অনেকটাই লুকোছাপা করে নিজের অতীতের কথা সানিকে বলেছিল পূর্বা। সানিদের বাড়িতে পূর্বাকে সাদরে সবাই আপন করে নিয়েছিল। সানিদের যাতায়াতের কারণে পূর্বা বেশ বুঝতে পারছিল আনন্দ ওর প্রতি আকৃষ্ট। সবই ঠিক ছিল কিন্তু নিজের স্বভাব লুকোবে কী করে! পূর্বার নিষ্পাপ সরল চাহনি মিষ্টি কথায় সানিদের বাড়ির সবাই মুগ্ধ। এরই ভেতর ব্যবসায়িক কারণে কাকার পরামর্শে সানিকে ওর বাবা ব্যবসার অংশীদার করে নিল। এমনই একটা কিছু সুযোগ যেন খুঁজছিল পূর্বা। এই বিষয়টি

নিয়ে কান ভারী করে সানির মা আর আর কাকিমার ভেতর সূক্ষ্ম লড়াই বাঁধিয়ে দিল। ক্রমেই পারিবারিক কলহে পরিণত হলো। পূর্বা আবার অন্যদিকে আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। আনন্দ জানিয়ে দিল পূর্বাকে ও বিয়ে করতে চায়। আনন্দর এই ঘোষণা সানির জীবন যেন বিপর্যস্ত করে দিল। সানি কোনও ভাবেই পূর্বার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। একদিন ঠিক খুঁজে বের করে পূর্বাদের পাড়ায় চলে গেল। পূর্বার অতীত ইতিহাস শুনে অবাক সে। বাড়িতে এসে সবাইকে জানিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সানির নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ তোলে পূর্বা। পুলিশ নিয়ম অনুসারে সানিকে আটক করে। পারিবারিক সম্মান বজায় রাখতে অনেক টাকা পুলিশ ও পূর্বাকে খেসারত দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করায়। ততদিনে সানিদের সামাজিক সম্মান অনেকটাই নষ্ট হয়েছে।

এই ঘটনার পর বাড়ি বদল করে বেশ দূরে চলে যায় পূর্বা। এখানেও পূর্বার ভাগ্য নিয়ে জীবনের অভিশাপ কাজ করেছে। পূর্বা যে বাড়িতে গিয়েছিল সেই বাড়িটি ছিল নিঃসন্তান এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দিপালী সেনের বাড়ি। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। অসংখ্য তাঁর ছাত্র ছাত্রী। পূর্বার ব্যবহার, কথার মায়াজাল আর নিজের জীবনের দুঃখের গল্প শুনে তিনি ওকে কাছে টেনে নেন। অল্পদিনের ভেতর পূর্বার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া, ব্যাংকের লেন-দেন, চিকিৎসা সব কিছুতেই পূর্বার মতামতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিপালীদেবী এক ছাত্রের সংস্থায় পূর্বাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। অল্পদিনের ভেতর সেই সংস্থার মালিককে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ও হাত করে ফেলে।

পূর্বা এবার শুরু করে এক বিষময় খেলা। দিপালীদেবীর ওষুধের দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেয়। ইচ্ছা করেই ভুল ওষুধ খাওয়াতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বিভিন্ন রকমের খাবার দিতে থাকে। সব মিলিয়ে দিনদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দিপালীদেবীর দীর্ঘদিনের পারিচারিকা মালতীকে ছাড়িয়ে দেয়। এরই ভেতর দিপালীদেবী স্থির করেন বাড়ি বিক্রি করে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবেন। পূর্বাকে দায়িত্ব দেন কাগজপত্র তৈরি করার। তিনি পূর্বাকে জানিয়ে দেন বেশ কিছু টাকা পূর্বাকে দেবেন। কিন্তু পূর্বার মনে ছিল অন্য ভাবনা। দিপালীদেবীকে মনভোলানো কথায় প্ররোচিত করে প্রথমে উকিল ও তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে এনে বাড়ি বিক্রি ও টাকা লেন-দেনের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিজের নামে করে নেয়। ওর ভাবখানা ছিল দিপালীদেবী একরকম জোর করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছে। দিপালীদেবী যখন খুব অসুস্থ সেই সময়। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সব টাকা নিজের কাছে রাখে পূর্বা। একদম শেষ সময়ে এক প্রতিবেশীর কাছে পূর্বার এই প্রতারণার কথা শুনেছিলেন দিপালীদেবী। পূর্বাকে তিনি কন্যার সমান ভালোবাসা মর্যাদা দিয়েছিলেন। বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন ওর ওপর। এতবড় আঘাত সহ্য করতে পারেন নি। অল্পদিনের ভেতর মারা যান তিনি।

পূর্বার হাতে এখন অনেক টাকা। এই ঘটনার পর শহরের দক্ষিণ প্রান্তে শহরতলীর দিকে বড় একটা আবাসনে ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনে বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু এখানেও তাই। আবাসনের কিছুটা বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের নাম করে স্বামী স্ত্রী, বিভিন্ন পরিবারের ভেতর বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া চলছিলই। স্বাভাবিক ভাবেই পরের দিকে প্রায় সকলেরই ওকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা বাড়ছিল।

দিন সবসময় একভাবে যায় না। পূর্বারও তাই। একদিকে বয়স বাড়ছিল অপর দিকে একাকিত্ব ঘিরে ধরছিল। মানুষের খারাপ করতে গিয়েও সারাজীবনই মানসিক অস্থিরতার ভেতর কেটেছে। এখন অসুস্থতা ঘিরে ধরছে। পঞ্চাশের আগেই হার্টের অসুখে কাবু করেছে ওকে। এই সময়টা একজন আপনজনের অপেক্ষায় কাটে ওর। টাকার জন্য দু'চারজন আত্মীয়স্বজন আসে ঠিকই কিন্তু তাতে পূর্বার একাকিত্ব কাটে না। ভাইয়ের মেয়েকে নিজের কাছে রেখেছিল কিছুদিন, কিন্তু অল্পকিছুদিনের ভেতরেই সেই ভাইঝি গোপনে আলমারি খুলে প্রচুর টাকা আর গয়না নিয়ে চলে যায়। পূর্বার কিছুই করার ছিল না। তবে সারা জীবন অন্যকে ঠকানোর ফল কিছুটা হলেও পেয়েছিল।

নিজের অসুস্থতা আর একাকিত্ব ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গভীর রাতে প্রায় অন্ধকার ঘরে দরদর করে ঘামছে পূর্বা। প্রবল শ্বাসকষ্ট আর জীবনী শক্তি হারানোর মুখে দাঁড়িয়ে ওর সারাজীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেই ছোট্ট বয়সের মামাতো বোনকে অকারণে মারধর করা, কত ছেলের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে টাকা নেওয়া, সানি আর ওদের পরিবারের সর্বনাশ করা, মিথ্যে কথা বলে কত পরিবারে অশান্তি বাঁধানো, পরিশেষে দিপালীদেবীকে সর্বস্বান্ত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া— চোখে যেন ঘোর লেগে আসে পূর্বার। চারদিক তার অন্ধকার লাগছে। মনে হলো সানি এসে দাঁড়িয়ে বলছে আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম। দিপালীদেবী বলছেন, তোকে আমি আমার মেয়ের জায়গাটা দিয়েছিলাম। আমার সবই তোরই হতো। কেন এমন করলি? কত মানুষ ওকে যেন ঘিরে আছে। তাদের ভিড়ে বাতাস আটকে যাচ্ছে। সবাই আলো নিভিয়ে দিচ্ছে কেন। বুকে ভীষণ ব্যথা। কেউ ওর কথা কেন শুনতে চাইছে না। বাতাস এত ভারী হয় নাকি। অন্ধকার এমন নিকষ কালো হতে পারে! □

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

দাশপাড়ার এক সাবিত্রী

গিরিধারী ধর





রাধারানির হাতে আজকাল কাজ ওঠে না। কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। কী হবে! বাড়িঘর, জায়গা-জমি, খেতের ফসল, পুকুরের মাছ কিছুই যেন নিজের নয়। দিনরাত শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করে। ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকে বারবার বলেন, মৃত্যু দাও ঠাকুর, মৃত্যু দাও। আর তো সইতে পারি না।

মেয়েটার দিকে তাকানো যায় না, সেদিন থেকে একেবারে বোবা হয়ে গেছে। স্কুলে যায় না, পড়ার বই-খাতা ছুঁয়েও দেখে না। প্রায় সারাক্ষণ শুয়ে থাকে, নয়তো খোলা বারান্দায় বসে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গাছপালা, বাড়ি-ঘর, আকাশ কী দেখে কে জানে। মাঝে মাঝে পুকুর ঘাটে গিয়ে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে জলের দিকে। রাধারানির মনে হয়, মেয়েটার চোখ জলে টলমল করে সারাক্ষণ। মেয়েটা কেন, নিজের ভেতরে যেভাবে কান্না গুমরে ওঠে, মাঝে মাঝে বাঁধ ভাঙে তাও কি রোধ করতে পারেন তিনি ! মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবেন, দু'কথা বলবেন, সেটাও পারেন না। মন আর সেভাবে এগোয় না। তবুও কাছে টেনে নেন মেয়েকে, টানলেই মেয়েটা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জনেই দু'জনের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজেন।

নিখিলেশ প্রথম প্রথম সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসতেন কাছে থাকলে, এখন চুপ করে থাকেন। নিজের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আগে মেয়েকে মায়ের বুক থেকে নিজের বুকে টেনে নিতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। টপ টপ করে চোখের জল পড়ে ভেসে যেতো সাবিত্রীর মাথা। আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন সাবিত্রী সেই পুরাণের পতিব্রতা সাবিত্রী। রাধারানিকে বলতেন, আমার ঘরে সাবিত্রী এসেছে, সত্যবানের হাতেই সঁপে দিতে চাই। সত্যবানের কথা শুনে আতঁকে উঠতেন রাধারানি। বলতেন, ওকথা বলো না। ভালো লাগে না।

সাবিত্রী বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান, দুজনের সব স্বপ্নই তাকে ঘিরে। প্রথম সন্তান সীতার মৃত্যুর প্রায় আট ন'বছর পর সাবিত্রীর জন্ম। বছর পাঁচেকের সীতা চলে গিয়েছিল দুদিনের জ্বরে, চিকিৎসার সুযোগ সেভাবে মেলেনি। গ্রামের ডাক্তার বুঝতে পারেননি যে জ্বর প্রাণ কেড়ে নেবে। সবে স্কুলে যেতে শুরু করেছিল। গান গাইতো। হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন নিখিলেশ। এক গানের শিক্ষক গান শেখাতে আসতেন। স্বপ্ন দেখতেন, সীতা বড়ো গায়িকা হবে, ঢাকায় গিয়ে পড়াশোনা করবে। বলতেন , একদিন এক রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেবেন প্রাণের সীতাকে। রাধারানি হাসতেন, তোমার যতো উদ্ভট স্বপ্ন।

নিখিলেশ বলতেন, স্বপ্নই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে রাধা। ওর গানের গলাটা দেখেছো ?

সেই সীতা চলে যাওয়ার পর ভেঙে পড়েছিলেন দুজনেই। কাজে মন বসতো না। সব যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। বাড়িটায় গানই যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শূন্য ঘরে দীর্ঘ সময় পর কোলজুড়ে আসে সাবিত্রী। সেই সাবিত্রীকে ঘিরে আবার নতুন স্বপ্ন। সাবিত্রী গান নয়, টেলিভিশন দেখে নাচতে চায়। পড়াশোনায়ও ভালো। এক সময় ভেবেছিলেন স্কুলের গণ্ডি পার হলে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে কলেজে পড়বে, নাচও শিখবে।

কিন্তু হিংস্র পশুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব ধ্বংস করে দিল। স্তব্ধ হয়ে গেল দাশপাড়া। মূক হয়ে গেছেন নিখিলেশ, মা-মেয়ের সামনে থেকে পালাতে পালেই যেন বাঁচেন। মা-মেয়ে দু'জনেই অভাগিনী, নিজেকেই অপরাধী মনে হয় নিখিলেশের। পশুদের হাত থেকে মা-মেয়ে কাউকেই রক্ষা করতে পারেননি। কেউ কি রক্ষা করতে পেরেছে গোটা পাড়ায়!

আজ সকাল থেকেই সাবিত্রী বিষণ্ণ মনে বসে আছে বারান্দায়। খুঁটিতে হেলান দিয়ে। মাটির ঘর, মাটির বারান্দা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সবকিছু যেভাবে ছিমছাম থাকতো এখন তা নেই। সকালে রাধারানি এক বাটি মুড়ি দিয়েছিলেন মেয়েকে, বাটিশুদ্ধ এখনও পড়ে আছে, বোঝা যায় সাবিত্রী ছুঁয়েও দেখেনি। নিখিলেশ দোকানে যাবেন। সকালেই বলছিলেন রাধারানিকে, মালপত্র কিছু নেই, কীভাবে দোকান চালাই বুঝতে পারছি না।

দাশপাড়া থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে রামগঞ্জ বাজার। উপজেলা সদর, তাই বাজার মোটামুটি জমজমাট। শহর থেকে দূরে, তাই গোটা উপজেলার মানুষই এই বাজারের ওপর নির্ভর করে। এলাকায় বিদ্যুৎ আসায় গত কয়েক বছরে চেহারা পাল্টে গেছে, পাল্টে গেছে জীবন-জীবিকাও। নিখিলেশ অনেক কষ্টে কয়েক বছর আগে রামগঞ্জ বাজারে একটা কাপড়ের দোকান করেছিলেন। চাষাবাদের মৌসুমে কিষাণ নিয়ে মাঠে থাকেন, দোকানেও যান। কর্মচারী আছেন দু'জন। মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারই বলা যায়। গোটা দাশপাড়ায় এরকম আরও কয়েকটি পরিবার আছে, ইদানিং শহরে চাকরিবাকরিও করে কয়েকজন। মেয়েরাও পড়তে যাচ্ছে ঢাকায়। দুই পরিবারের তিন ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে চাকরি নিয়ে। নিখিলেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন বাড়িটা পাকা করা দরকার। এক কথায় দাশপাড়া এখন অর্থনৈতিকভাবে আগের তুলনায় সমৃদ্ধ জনপদ। সকালে গরম ভাত খেয়ে নিখিলেশ দোকানে চলে যান। যাওয়ার সময় পান মুখে গুঁজে দেন রাধারানি। 'দুর্গা দুর্গা' বলে একই কথা উচ্চারণ করেন প্রতিদিন— বেশি রাত করো না, তাড়াতাড়ি ফিরো।

এ কথাগুলোই এখন ভুলে গেছেন তিনি। নিখিলেশ সেই হামলার পর থেকে দোকানে যাননি, এখন দু'একদিন ধরে যাচ্ছেন। কিন্তু দোকানে যাওয়াই সার, মালপত্র নেই, তাই বেচা-কেনাও নেই। স্বাভাবিক অবস্থা এখনো ফিরে আসেনি। তবু দোকানে গিয়ে বসে থাকতে হয়। নিখিলেশ শুধু নয় রামগঞ্জ বাজারের সব হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানপাট লুট হয়ে গেছে। তারা মনে করছেন, দোকান ফেলে রাখলে বেদখলও হয়ে যেতে পারে। সবার মতো নিখিলেশও দোকান খুলে বসে থাকেন, কর্মচারী দুজনও আসেন। কিন্তু দোকান ফের কীভাবে চালু করবেন ভেবে কুলকিনারা পান না।

শুধু দোকান নিয়েই কী দুশ্চিন্তা ? নিখিলেশ ভেবে পান না কী করবেন !

সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। শুধু নিখিলেশের পরিবার নয়, দাশপাড়ার শ'দেড়েক হিন্দু পরিবারের সবাই হামলার শিকার হয়েছেন। তছনছ হয়ে গেছে মোটামুটি সাজানো-গোছানো এই জনপদ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নারকীয় হামলার পর আরেকবার পাশবিক নৃশংসতা দেখলো দাশপাড়া। তফাত শুধু হামলাকারী বদল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে হামলা করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল বদররা। আর এবারে যাদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসা, জীবন-জীবিকায় যারা জড়িয়ে আছে দীর্ঘ সময়। বিভেদের দেয়াল উঠতে শুরু করেছিল আগেই, হিন্দুরা মুসলমান রাজনীতির হাত ধরে মুসলমান হয়ে গেলো।

নিখিলেশ দোকানে রওনা হয়ে ঘর থেকে বেরুতেই সাবিত্রীকে দেখলেন। সকাল থেকেই দেখছেন, কিন্তু এবার থমকে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, মা রে! এভাবে বসে থাকিস না। ঘরে যা। লেখাপড়াটা আবার শুরু কর মা।

নিখিলেশ জানেন, সাবিত্রী কোনো জবাব দেবে না। জবাব দেবেন না সাবিত্রীর মা-ও। তিনি পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, রাধারানি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাইরে যাওয়ার মুখে এখন আর পান তুলে দেন না মুখে, দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন না। বলেন না, বেশি রাত করো না। কিংবা বলেন না, ফেরার পথে অমুকটা নিয়ে এসো। নিখিলেশ জানেন, পেছন ফিরলেই তিনি রাধারানির চোখে জল দেখবেন। তাই পালিয়ে বাঁচতেই হুট করে ছাতাটা তুলে নিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন— যাই, বৃষ্টি নামতে পারে। আকাশে মেঘ নেই, তবুও পালিয়ে বাঁচার জন্যেই যেন একটা অজুহাত খুঁজলেন নিখিলেশ।

****

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুলসীমঞ্চের পাশ দিয়ে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ান নিখিলেশ, মাথা ঠেকান। মন্দিরের পাশেই ব্রহ্মচারীর সমাধি, কে যেন কিছু ফুল রেখে গেছে সমাধির ওপর। এলোমেলো মাটি, কোনোরকমে সমাধি হয়েছে ব্রহ্মচারীর। মন্দিরে এখনো নরপশুদের হামলার চিহ্ন, রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। পূজার নানা সামগ্রী, ছেঁড়া ও আগুনে পোড়া গীতা ও অন্যান্য বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সেদিনের পর থেকে পূজা বন্ধ রয়েছে। মন্দিরে কেউ আসছেন না। আবার নতুন করে পূজা শুরু হবে কিনা কেউ জানেন না।

নিখিলেশ জানেন এখান থেকে পেছন ফিরলে মেয়ে ও মাকে সেভাবেই দেখতে পাবেন। তিনি তাকাতে চান না, প্রণাম সেরেই দ্রুত পা চালান। পুকুরের পাড় ঘুরে রাস্তায় নামেন, এখন গাছপালার আড়ালে চলে গেছে বাড়ি ও মন্দির। এবার গতি শ্লথ হলো, সাবিত্রী ও রাধারানির কাছ থেকে তিনি এভাবেই পালিয়ে আসেন। ক'দিন পালিয়ে বাঁচবেন জানেন না।

উপজেলার ছোট্ট গ্রাম হৃদয়পুর, স্থানীয় ভাষায় হৃদিপুর। তারই শেষ প্রান্তে অনেকটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাশপাড়া। এই পাড়ার পরিবারের সংখ্যা আজ প্রায় দেড়শোতে এসে ঠেকলেও চল্লিশের দশকে এই সংখ্যা ছিল পাঁচশোর ওপরে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জনপদ না হলেও মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ ছিল, দুর্গাপূজা কালীপূজা হতো, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকতো ঘরে ঘরে।

কৃষি কাজই ছিল এই পাড়ার মানুষের মূল পেশা। চিড়ে-মুড়ি ভাজা, বেতের কাজ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। কারও কারও মাছের ব্যবসা। চিড়েমুড়ি, শাকসবজি যেতো আশেপাশের গাঁ-গঞ্জে, আর বেতের সামগ্রী যেতো ঢাকা-চট্টগ্রামে। ফরমায়েশ আসতো দূর দূরান্ত থেকে।

সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় প্রথম ছোবল আসে। দাশপাড়া সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে উন্মত্ত রাজনীতি দেখে, সেই প্রথম ভয়াবহ হিংস্রতার মুখোমুখি হয়। দাশপাড়া আক্রান্ত হলো প্রথম বার। অপরাধ কী দাশপাড়ার মানুষ বুঝতে পারেনি। শুধু শুনলো সবাই, মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হচ্ছে, হিন্দুদের দেশ আলাদা।

নিখিলেশের তখন জন্ম হয়নি। বাবার মুখে শুনেছে, বাড়িঘর লুট হলো, আগুন লাগানো হলো, মেয়েদের ওপর অত্যাচার হলো, কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। বাবা মুরলী দাশ গিয়েছিলেন কুমিল্লায় কী একটা কাজে, যখন খবর পেয়ে ছুটে এলেন তখন দাশপাড়ার ঘরে ঘরে কান্না, আর্তনাদ। এরই মধ্যে শোনা গেল পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গেছে। মুসলিম লিগের নেতারা সদর থেকে এসে দাশপাড়ায়ও পুঁতে দিয়ে গেল সবুজ সাদা চাঁদ-তারা পতাকা।

শুরু হয় ভাঙনের পালা। মুরলীবাবুর জায়গা-জমি ছিল কিছু, ধান ও অন্যান্য ফসল ওঠে, বছর চলে যায়। মাঝে মাঝে বেতের কাজের ফরমায়েশ পান, চালান যায় কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা। কিছু আয় হয়। সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পাড়ার লোকজন জড়ো হয়। কীর্তন হয়, আড্ডা হয়। কিন্তু চাঁদ-তারা পতাকা ওড়ার পর থেকে মন্দির ফাঁকা, পাড়ার লোকজন এলে মুরলীবাবুর ঘরে বসেন।

নিখিলেশের জন্ম কয়েক বছর পর। বড় হলে, স্কুলে ওপরের দিকে পড়ার সময় বাবার মুখে সেসব দিনের কথা শুনেছে, মন খারাপ হলে বাবা সেসব দিনের ছবি তুলে ধরতো।

মুরলীবাবু বলতেন, সন্ধ্যার পরে পাড়ার অনেকেই আসতেন। এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা পাড়ার সবাইকে ঘিরে ধরেছে। একদিন সুধীরদা বললেন, দেশ ছাড়তে হবে মুরলী, এ ছাড়া উপায় নেই।

নবীনদা বলেন, পাকিস্তান আমাদের জন্যে নয়। মুরলী একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাবা আঁতকে ওঠেন, সিদ্ধান্ত মানে দেশ ছাড়ব ? এই মাটি ?

এই মানুষগুলো এই মাটিরই সন্তান, মাস্টারমশাই সুন্দরভাবে বলেন, ভূমিপুত্র। তাহলে এই মাটি ছাড়তে হবে কেন ? বাবা সবসময় এই কথাই বলতেন।

ঘরে তামাকের ধোঁয়া, কারও মুখে কোনো কথা নেই। বাবার মুখে শুনে নিখিলেশের মনের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে সেদিনের চিত্র কল্পনা করে। বাবাই বলেন, দেশ ছাড়ার কথা শুনে মনে যন্ত্রণা অনুভব করি। এই বাড়ি, মন্দির, পুকুর, ধানখেত, পাহাড়ের পর পাহাড় যে মমতা ছড়িয়ে রেখেছে দাশপাড়াকে কোলে নিয়ে তা ছেড়ে যেতে হবে ? আর দেখা হবে না গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী ইরা'র সঙ্গে। এভাবেই প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যা-রাতে বিষণ্ণ আলোচনা এগিয়ে চলে। ফিসফাস আলোচনা— ভয়, দেয়ালেরও কান আছে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই শোনা গেল সুধীরদা রাতে কোনো এক সময়ে চলে গেছেন। কেউ টের পায়নি আগের দিন সন্ধেবেলাতেও। এভাবে খালি হয়ে গেল অনেক বাড়ি। চলে গেল বন্ধুদের অনেকে। বাবা কিন্তু অনড় , মা মাঝে মধ্যে কথা তোলেন। বাবা বলেন, এ মাটি ছেড়ে গিয়ে বাঁচবো না শশী। ওরা গেছে, কিন্তু ভালো থাকবে কি ? মা আর কথা বাড়ায় না।

বাবা যেন ইতিহাস তুলে ধরেন মাঝে মধ্যে। দেশভাগের কয়েক বছর পরই খবর আসে, পাকিস্তান বাংলাভাষা তুলে দিতে চায়, দেশের ভাষা হবে উর্দু। ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকায়, মারাও গেছে কয়েকজন। অবশেষে পাকিস্তানিরা মাথা নত করে, বাংলাভাষার জয় হয়। এরপরই আসে চুয়ান্ন সালের নির্বাচন। সাড়া পড়ে যায় গোটা দেশে, বিপুল উৎসাহে ভোটে নামে দাশপাড়ার মানুষ। মুরলীবাবু বিপুল উৎসাহে দৌড়ান বাড়ি বাড়ি, নাওয়া খাওয়া নেই। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সভার পর সভা। হ্যাজাক জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চলে সভার কাজ, যুক্তফ্রন্টের নেতারা আসেন। আওয়ামি লিগ যুক্তফ্রন্টের প্রধান দল। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও চুয়ান্নর নির্বাচনে দেশভাগের গ্লানি অনেকটা চাপা পড়ে যায়। হিন্দুরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। নির্বাচনের ফল বেরোলে সেকি আনন্দ দাশপাড়ায়, গোটা গ্রামে। হিন্দু-মুসলমান সবাই এক সঙ্গে মিছিলে, উল্লাসে। বাবা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, জানো শশী দেশের মানুষ সেই মুসলিম লিগওয়ালাদের হারিয়ে দিয়েছে, যারা পাকিস্তান এনেছিল।

সে এক বিস্ময়। মুরলী মনে করেন, চোখ খুলে যাচ্ছে, অনেক কিছু পরিষ্কার হচ্ছে। স্ত্রীকে বলেন, এদেশ ছাড়তে হবে না শশী। দেখছ না দেশ বদলে যাচ্ছে। দেশে সবাই মিলে আমরা থাকবো। শশীবালাও অন্যদের মতো নতুন স্বপ্ন দেখেন। তিনি রাজনীতির অতোশতো বোঝেন না, হাত দুটো কপালে ঠেকান রাধাগোবিন্দের উদ্দেশে।

দেশ ছাড়তে হবে না, বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে না, এই কয়েকটি শব্দ স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয় গোটা দাশপাড়ায়। সেদিন বাবা এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বলেই আজ এ মাটিতেই জীবন।

মুরলীবাবু নির্বাচনের পর দ্বিগুণ উৎসাহে ঢাকা-চট্টগ্রাম দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। দাশপাড়া উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। বাবা একদিন ঢাকা থেকে ফিরে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, দেশে ফের অশান্তি শুরু হলো। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারিরা। সেনাপতি আইয়ুব খান ক্ষমতা নিয়েছে।

নিখিলেশকাকা, আপনি কি দোকানে চললেন ?

হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন নিখিলেশ, ফিরে এলেন অতীত থেকে। সেই কতোদিন আগে বাবার তুলে ধরা ইতিহাস যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভাসছে। আজ আরও বেশি করে মনে পড়ছে সেই সময়ের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, ক'দিন থেকে তিনি সব হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ধারণা করছেন, একই ঘটনা, একই রাজনীতি ঘুরে ফিরে আসছে।

হ্যাঁ বাবা। তা তুমি কোথায় চললে অভিজিৎ ?

আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম কাকাবাবু, কথা ছিল।

বল, এখানেই বল। আমার তাড়া নেই। দোকানে যাই নিয়মরক্ষার জন্য। মালপত্র নেই, তবু বসে থাকতে হয়। ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

অভিজিৎ ঢাকায় থাকে। চাকরি করে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায়। গবেষণা আধিকারিক। হামলার আগে এসেছিল, আর ফিরে যেতে পারেনি। ইসলাম অবমাননার কথিত অভিযোগে নির্মম আক্রোশে মজহবি নরপশুরা যেদিন হামলে পড়ে দাশপাড়া ও রামগঞ্জ বাজারে, তাদের হিংস্র বর্বরতায় রক্ত ঝরে, আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ লাল হয়ে ওঠে, ধর্ষিতা নারীদের আর্ত চিৎকারে এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় গোটা জনপদে— এই বিভীষিকা থেকে রেহাই পায়নি অভিজিতের বোন প্রিয়াঙ্কাও। ঢাকায় লেখাপড়া করে, কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এসেছিল। বাড়িতে লুটপাটের পর প্রিয়াঙ্কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নরপশুরা একের পর এক। ঘটনার একদিন পর আত্মহত্যা করে প্রিয়াঙ্কা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অনার্সের ছাত্রী।

অভিজিৎ এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ঢাকার খবরের কাগজে এখানকার সব ঘটনা ছাপা হওয়ার পর এমপি সাহেব খুব ক্ষেপে গেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, কয়েকটি কাগজ ও টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের

তিনি এখানে নিয়ে আসবেন। তাদের সামনে আমাদের বলতে হবে, এখানে কিছুই হয়নি। কয়েকটি খবরের কাগজে মিথ্যে লেখা হয়েছে, টেলিভিশন চ্যানেলে ঠিক খবর পরিবেশিত হয়নি।

কিন্তু গোটা এলাকায় এখনো ধ্বংসের ছাপ, লণ্ডভণ্ড আগুনে পোড়া বাড়িঘর, মন্দির। এগুলো লুকাবে কী করে ?

শুনেছি কয়েকদিন সময় দেওয়া হবে, এরই মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

নিখিলেশ ম্লান হাসেন, আর কী কী করতে হবে বলেছেন কিছু ? ক্ষোভ আর আক্রোশে আরও কিছু বলতে চাইলেন, পরে নিজেকে সংযত করলেন। অভিজিতের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সন্ধ্যার পর বাড়ি এসো, দেখা যাক সবাই কী বলে।

মাস্টারমশাইয়ের অভাব মনে মনে অনুভব করলেন নিখিলেশ, এ সময় তিনি পাশে থাকলে সাহস পাওয়া যেতো। নরপশুরা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি।

****

রামগঞ্জ উপজেলা সদরের বাজারের ওপরই গোটা এলাকার মানুষ নির্ভরশীল। ইদ-পূজায় বাইরে যেতে হয় না কেনাকাটার জন্যে, এখানেই কাপড় , জুতো, আসবাবপত্র এমনকী রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফ্রিজ সবই মেলে। কিছুদিন আগে ফোটোকপি মেশিন এসেছে, মানিগ্রামের দোকানও চালু হয়েছে। এককথায় রামগঞ্জে শহরের ছোঁয়া লেগেছে। আগে দোকান নিয়েছিলেন বলে সস্তায় পেয়েছিলেন নিখিলেশ। বাবার বেতের কাজের ব্যবসায় তিনি যাননি। যতোই রমরমা বাড়ছে রামগঞ্জের, দোকানপাটের দামও চলে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নতুন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে দু'এক বছরের মধ্যে রামগঞ্জ পৌরসভা হবে। রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

নিখিলেশের কাপড়ের দোকান অনেকটা মাঝামাঝি এলাকায়। নিখিলেশ এসেই দেখেন তার দোকান খোলা হয়েছে। লক্ষ্মীবাবু দোকান খুলেছেন, কর্মচারী হলেও বন্ধুর মতো। বাড়ি কাছেই। রামগঞ্জ বাজারের কাছে তার বাড়িও লুট হয়েছে। পাশে অন্যান্য হিন্দু বাড়িও। তবে আশেপাশে মুসলমান বাড়ি থাকায় আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে। কয়েকটি পরিবারে মেয়েদের ওপর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

লক্ষ্মীবাবুই জিজ্ঞেস করেন, কিছু ঠিক করলেন, মালপত্র তুলবেন?

আপনিই বলুন, কী করা যায় ? এখনই মালপত্র তুলবো, নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবো?

এর কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব নেই, লক্ষ্মীবাবু জানেন। কী পরামর্শ তিনি দেবেন ! নিখিলেশ যা হারিয়েছেন তা কোনোভাবে পূরণ হওয়ার মতো নয়। নিখিলেশ শুধু নয়, হিন্দুদের সব দোকানপাটের অবস্থা একই। দোকানে হামলা ভাঙচুর করার পর মালপত্র লুট হয়ে গেছে। দোকানে এখন অনেকে এসে বসছেন, কিন্তু মালপত্র নেই।

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। কেউ কোনো কথা খুঁজে পান না। নিখিলেশ দোকানের ভেতরে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তিল তিল করে সাজিয়েছিলেন দোকানটি, সব ধ্বংস করে দিল জেহাদিরা। আবার দোকান সাজাবেন, মালপত্র তুলবেন, সেরকম মনের শক্তি পাচ্ছেন না। বাজারের অন্যান্য হিন্দু দোকানিরা কী ভাবছেন এখনো জানতে পারেননি।

গোটা বাজারে হিন্দু দোকানগুলো এখনো নির্মম হিংস্রতার সাক্ষ্য বহন করছে। দোকানে বসেই নিখিলেশ বাইরে দৃষ্টি রাখলেন। মুসলমানদের দোকানগুলো খোলা থাকলেও খদ্দের কম, দু'চার জন দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে পড়ছে, তখন অল্প বয়স। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজাকার, আল-বদরের দল লুটপাট,হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানপন্থীরা একলা এসে হামলা করতে সাহস করেনি। আজ ভিন্ন চিত্র, কোথায় যেন দেয়াল উঠে গেছে। নরপশুরা দাশপাড়ায় যখন হিংস্র উল্লাসে স্লোগান দিতে দিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাউকে পাশে পাওয়া যায়নি। কয়েকজন পুলিশ পাঠিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন, তারাও উন্মত্ত জেহাদিদের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। রামগঞ্জ বাজারেও একই অবস্থা। তফাত দাশপাড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছিল লুঠপাট, নির্বিচার ধর্ষণের পর রামগঞ্জবাজারে আগুন দেওয়া হয়নি। কারণ আগুন দিলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন।

এ এক ভিন্ন সময়। বাবা যে চিত্র তুলে ধরতেন, কিশোর বয়সে তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন ষাটের দশকে। বাঙ্গালির স্বাধিকারের আন্দোলন, এক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়তে মরণপণ লড়াই দেখেছেন। ষাটের দশক, অগ্নিগর্ভ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। সামরিক একনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান গুলি চালিয়ে, রাজপথ রক্তাক্ত করে আন্দোলন দমন করতে পারছে না। সারাদেশ জেগে উঠেছে। পাকিস্তানি শাসকরা মনে করতো বাঙ্গালির এভাবে জেগে ওঠার পেছনে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক কবি। তাঁর গান নিয়ে, কবিতা নিয়ে এরা পথে নামে। আন্দোলন করে। একষট্টি সালে এই কবির জন্মশতবর্ষ ছিল। জন্মশতবর্ষের কোনো অনুষ্ঠান যেন উদযাপিত না হয় সেজন্যে কঠোর অবস্থান নেয় পাকিস্তানি সামরিক শাসক। কিন্তু কোনোভাবে অনুষ্ঠান বন্ধ করা যায়নি। ঢাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয় দুদিনের, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে যেন রবীন্দ্র উৎসব। সরকার খবর পায়, যতো নষ্টের গোঁড়া বাঙ্গালি কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-

শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমাজ। সরকারের ভেতরে পদস্থ কর্মকর্তাদের একটি অংশও নাকি এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে গোপনে সহযোগিতা করেছে। তাদের চিহ্নিত করতে চেষ্টা করা হয়, পারা যায়নি। মরিয়া সরকার ষাটষট্টি সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা নিষিদ্ধ করে। যুক্তি দেখানো হয়, তিনি ভারতীয় কবি। পাকিস্তানের সংস্কৃতির পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। রাজপথে নেমে আসে প্রতিবাদী মানুষ। শুধু ঢাকা নয়, গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদ। এক সময় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার। অন্যদিকে স্বাধিকারের আন্দোলন রুখতে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে কারাগারে পোরা হয়েছিল। দেশদ্রোহিতার দায়ে বিচার চলছিল সামরিক আদালতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বলা হয়, শেখ মুজিব ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চান। গণ-অভ্যুত্থান সবকিছু তোলপাড় করে দেয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কারাগার জ্বালিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্ত করার হুঙ্কার দেন। অবশেষে অভিযোগ তুলে নিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই ঘটনা পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটায়। জেনারেল আইয়ুব খানকে সরিয়ে ক্ষমতার মঞ্চে আসেন সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি এসে গণ-অভ্যুত্থান শান্ত করতে অচিরে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আশ্বাস দেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই তিনি সেনানিবাসে ফিরে যাবেন। তারপর অন্য ইতিহাস। নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের অস্বীকৃতি। নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তারপরও ইয়াহিয়া ও সামরিক কর্মকর্তাদের অনমনীয়তার মুখে এই ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক। তিরিশ লক্ষ প্রাণ, লক্ষ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানি ও ধ্বংসস্তূপের ওপর বিজয়, স্বাধীনতা। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

নিখিলেশ ভাবেন, এই দীর্ঘ মুক্তির লড়াই ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানুষে মানুষে ভেদরেখা ঘুচে গিয়েছিল তা আজ কি মুছে গেল? পাকিস্তান সরকার কায়েমি স্বার্থে মজহবি অন্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করেছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশের জন্ম। এ মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা ঠাঁই পেতে পারে না। তবু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুর্গাপূজায় হামলা হয়, পাকিস্তানি আমলে প্রণীত 'শত্রু সম্পত্তি আইন' স্বাধীন দেশের মাটিতে 'অর্পিত সম্পত্তি' নামে অব্যাহত থাকে, এই আইনে জায়গা-জমি হারিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হয়। এক সময় এই আইন বাতিল হলেও যারা বাংলাদেশে এখনো মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তারা নিজের বাড়ি ও জমি ফেরত পাননি। হামলা, নির্যাতন, জায়গাজমি দখল, মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর অব্যাহত গতিতে চললেও কোনো বিচার নেই। বিচারহীনতার বিচার দেখতে দেখতে হিন্দুরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এক নতুন বিপত্তি যুক্ত হয়েছে। ইসলাম ও নবীকে অবমাননার অভিযোগ তুলে কোনো ব্যক্তিকেই শুধু নিশানা করা হচ্ছে না, গোটা পাড়ায়, বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা, তাণ্ডব চালানো হচ্ছে। লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। এই বিপত্তির সর্বশেষ শিকার দাশপাড়া, রামগঞ্জ বাজার।

মুক্তিযুদ্ধের কথা নিখিলেশের কিছু মনে আছে। দাশপাড়ার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সবাই বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তান আর থাকছে না, স্বাধীনতা আসছে। ছেলে-বুড়ো সবাই আবেগে ভাসছিল। মিছিল হচ্ছিল। শেখ মুজিবের 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ডাক সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল। মাস্টারমশাই দাশপাড়ার তরুণ নেতা, তিনি তখনই বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। সংগঠিত



Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor, Kolkata-700 007

(s) 2272-5487 Mob : 9331105467



করেন তরুণদের। রাজধানী-সহ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়া ও গণহত্যার খবরের পাশাপাশি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাও পৌঁছে যায় দাশপাড়ায়। সে এক অবিস্মরণীয় সময়। তারপর মুক্তিযুদ্ধ। মাস্টারমশাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে দাশপাড়ার তরুণদেরই শুধু সংগঠিত করেননি, স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। মুসলমান যুবকরাও সংগঠিত হন তাঁরই নেতৃত্বে। মাস্টারমশাই সবাইকে নিয়েই সীমান্তের ওপারে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন, পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করেন। বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন। বীরগতিপ্রাপ্ত হন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মাস্টারমশাইও গুরুতর আহত হয়েছিলেন। ভারতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি তিরানব্বই হাজার সেনা-সহ আত্মসমর্পণ করেন ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা জানতো, মাস্টারমশাই এলাকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব মানুষের প্রিয় নেতা। তাই প্রচণ্ড হিংস্রতায় শুধু দাশপাড়া নয়, আশেপাশের মুসলমান পল্লীগুলোর ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রক্তাক্ত হয়েছিল গোটা জনপদ। কিন্তু

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে দেখা গেল, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সে নৈকট্য স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। ধর্মান্ধতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ক্রমেই হিংস্র রূপ নিতে শুরু করলো। ফিকে হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত রাজনীতি ফিরে এলো প্রচণ্ড দাপটে, সেই পাকিস্তানি শক্তি নিয়ে।

নিখিলেশের সামনে সেই অতীত যেন বারবার এসে কড়া নাড়ছে। মাস্টারমশাই, বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ চক্রবর্তী লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে বলছেন, যুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ এনেছি। কোনোদিন মাথা নত করিনি। আমরা সবাই মিলে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবো। যারাই পাকিস্তানের নষ্ট রাজনীতি আবার ফিরিয়ে আনতে চায় আমরা তার বিরুদ্ধে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবো। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর বাবা মুরলী দাশ চলে গেলেন। তার পরপরই মা। বাবা বলতেন, আমি যেদিন থাকবো না, মাস্টারমশাই অভিভাবক হয়ে থাকবেন। দাশপাড়ার নবীন-প্রবীণ সবার অভিভাবক মাস্টারমশাই। জানকীপ্রসাদ নামটা 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র আড়ালে চলে গেছে।

****

সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্বাধীনতার পর থেকেই 'মুক্তির মানুষ' হিসেবে গোটা জনপদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সমান অধিকারের রাজনীতি ধ্বংস করে পরাজিত পাকিস্তানি রাজনীতি ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছিলেন এটা ষড়যন্ত্র। এও বুঝতে পারছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা, হিংস্রতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের রাজনীতি অঙ্কুরিত করে বটবৃক্ষে পরিণত করা হচ্ছে, আবার অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, তার ঝাপটা এই জনপদেও এসে ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি বেদনার্ত হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন না।

স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জানকীপ্রসাদ। কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি ক্লাস নিতেন কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়াই। বলতেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, ছাত্র পড়িয়েছি। পড়ানো থেকে অবসর নিলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল্?

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী মনোরমাও শিক্ষিকা, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, তিনিও অবসর নিয়েছেন। এখন অসুস্থ। একমাত্র মেয়ে লাবণ্য, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার সেই লাবণ্য নাম মাস্টারমশাইয়ের প্রিয়। তাই মেয়ের নাম রেখেছেন । লাবণ্যর বিয়ে হয়েছে , ঢাকায় থাকে। স্বামী এক সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। লাবণ্য কলেজে পড়ায়। পুরনো ঢাকায় থাকে, তাদের একমাত্র সন্তান সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ে।

মাস্টারমশাই স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারাও গড়ে তুলেছেন এলাকায়। তিনি বিশ্বাস করেন মুক্তমনের মানুষ গড়তে হলে শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলন চাই। সেভাবেই তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন এবং ফুটবল-ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিয়মিত শরীরচর্চার জন্যে যোগকেন্দ্র হয়েছে। এগুলো নিয়েই তাঁর সময় কাটতো। মাঝে মধ্যে সবাইকে নিয়ে বসতেন, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতেন। বলতেন, আমরা অনেক ছিলাম, আজ মাত্র কয়েকশো মানুষে নেমে এসেছি। এ সংখ্যা যেন আর কমে না যায়। মাস্টারমশাই তুলে ধরতেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। আজ সরকারি হিসেবেই এই হার ৮ শতাংশের কমে নেমে এসেছে। আমরা এ মাটির সন্তান, দেশ ত্যাগ করবো কেন? এ মাটিতেই লড়াই করে বাঁচতে হবে।

মাস্টারমশাইয়ের এই কথাগুলো সবাইকে সাহস জোগাতো। একাত্তরের পর থেকে বৈরী পরিস্থিতি বারবার হানা দিয়েছে এই জনপদে। হামলা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ সত্ত্বেও আবার ঘুরে দাঁড়াতে সাহস জুগিয়েছেন মাস্টারমশাই। সেই মানুষটিকেই এবার সরিয়ে দিয়েছে নরপশুরা। পশুদের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

সেই ভয়ংকর দিনটির কথা মনে হলে এখনো শিউরে ওঠে দাশপাড়ার মানুষ, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। এখনো হামলার ছাপ দাশপাড়ার সর্বত্র, রামগঞ্জে। সেদিন দুপুরের দিকে রামগঞ্জে হঠাৎ শোনা গেল, মাস্টারমশাই ইসলাম অবমাননা করেছেন। তাঁর মোবাইল থেকে ফেসবুকে এরকম একটি বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। বার্তায় কী ছিল কেউ জানে না, দেখেনি। মাস্টারমশাইয়ের কানে যখন খবরটি পৌঁছালো তখন তিনি দুপুরে খেতে বসেছিলেন। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এরকম কোনো বার্তা তো তিনি দেননি। এটা হতেই পারে না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভাত খেয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। পাশে ছিলেন মনোরমা। পাড়ার কয়েকজন ছুটে এসেছেন বাড়িতে, একী শুনছি মাস্টারমশাই?

আমিই তো বুঝতে পারছি না, এরকম কথা কেন বলা হচ্ছে। আমার তো কোনো ফেসবুকই নেই। আমি তো ব্যবহার করি না। নিশ্চয়ই কেউ কৌতুক করেছে।

কৌতুক যে নয় একটু পরেই টের পাওয়া গেল। ছুটে এসে একজন খবর দিল, দাশপাড়ার দিকে একটি মিছিল আসছে। মিছিলে মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান হচ্ছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্লোগান হচ্ছে। দাশপাড়ার সবাই বাড়ি

থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে।

তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মাস্টারমশাই। এ কী করে হয় ? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। ততক্ষণে মিছিল দাশপাড়ায় ঢুকে পড়েছে। এগিয়ে আসছে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দিকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, মিছিল প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। সামনে ব্যানার দেখা যাচ্ছে, 'ইসলাম অবমাননাকারী জানকী মাস্টারের ফাঁসি চাই'। 'হিন্দুরা দেশ ছাড়'। 'আল্লাহ-রসুলের অপমান মানবো না, মানবো না'। মিছিলের সামনে যারা তাদের কাউকে কাউকে তিনি চেনেন। সঙ্গে যে ছেলেরা রয়েছে তাদের স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্র বলে মনে হয়। কয়েকজনের হাতে লাঠি, বড় বড় ছোরা।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির উঠোনে তখন স্লোগান আর স্লোগান, লাফিয়ে উঠে শক্তিমত্তা প্রকাশ করা হচ্ছে। মাস্টারমশাই হাত উঁচিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বলছেন, বাবারা আমার কথা শোন। তোমরা ভুল করছো। এসো আমাকে বল, আমি কী করেছি। উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথাটা শোন বাবারা। মাস্টারমশাইয়ের পাশে স্ত্রীও এসে দাঁড়ালেন। তিনিও হাত জোড় করে আকুতি জানাতে লাগলেন, বাবারা শোন।

কেউ শুনছে না মাস্টারমশাইয়ের কথা, মনোরমার কথা। হঠাৎ কয়েকজন লাঠি-চাপাতি (বড় আকৃতির ছোরা) হাতে বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠে মাস্টারমশাইকে ধরে, টেনে-হিঁচড়ে উঠোনে নামিয়ে কোপাতে লাগলো, লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে-বাতাসে। সেই আর্তনাদ ছাপিয়ে উল্লাস ও স্লোগান। রক্তাক্ত হয়ে গেল উঠোন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের রক্তাক্ত দেহ নিথর হয়ে গেল। দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন মনোরমা। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে পাড়ার ছুটে আসা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

মিছিলের এক নেতা হাতমাইকে (হ্যান্ডমাইক) এই হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের বিজয় বলে ঘোষণা করে 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিলেন। প্রত্যুত্তরে আকাশ-ফাটা গর্জন, 'আল্লাহু আকবর'। অনেকক্ষণ ধরে চলে ইসলামের বিজয় উৎসব। এরপরই ইসলামের সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়ে গোটা দাশপাড়ায়। প্রথমে লুটপাট, তারপরই ধর্ষণের আরেক উৎসব। মা-মেয়ে কারও রেহাই নেই। গোটা পাড়াজুড়ে চিৎকার, আর্তনাদ। মাঝেমধ্যে নরক গুলজার করা 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। লুঠপাট, ধর্ষণ শেষ হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ। এর মধ্যেই একটি দল মন্দিরে হামলা করে। রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো করার পর পূজারি মাধব ব্রহ্মচারীকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর দেহে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারীর দেহ যখন পুড়ছিল তখন আনন্দে ফেটে পড়ছিল ইসলামি শান্তিসেনারা।

সূর্য গেছে অস্তাচলে, আঁধার নেমেছে দাশপাড়ায়। বিধ্বস্ত এই জনপদের আকাশ তখন লাল রক্তবর্ণ। বাড়ি, গাছপালা সব ছায়া হয়ে গেছে। যেন এক ভৌতিক পরিবেশ। অধিকাংশ বাড়ি থেকে তখনো লেলিহান শিখা ভীতি ছড়াচ্ছে। পরে জানা গেছে, হামলাকারীরা গান পাউডার ও কেরোসিন ব্যবহার করেছিল, তারা এসেছিল তৈরি হয়েই। দাশপাড়ায় ধ্বংসকাজ শেষ করার পর হামলাকারীদের বেশিরভাগই রামগঞ্জে ছুটে যায়। সেখানে আশেপাশে কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ও বাজারের হিন্দু দোকানগুলো বেছে বেছে ভাঙচুর করে, লুটপাট চালায়। তবে এখানে অগ্নিসংযোগ করেনি, কারণ পাশের মুসলমানদের বাড়িঘর ও দোকানপাটও ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

মাস্টারমশাইয়ের মৃতদেহ উঠোনে পড়েছিল, পাশেই সংজ্ঞাহীন মনোরমা। হত্যাকাণ্ডের পর মৃতদেহের পাশে কেউ ঘেঁষতে সাহস করেনি। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর একজন-দুজন করে এগিয়ে আসেন প্রতিবেশীরা। না, কোনো শব্দ নেই, এক শুনশান নীরবতা যেন নারকীয় ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কাঁদছেন সবাই, কিন্তু নিঃশব্দে, ভয় কান্নার আওয়াজ যেন হামলাকারী পশুরা শুনতে না পায়। এখন আবার কিছু পুলিশ দেখা যাচ্ছে। হামলার সময় কয়েকজনকে দেখা গিয়েছিল। পরে তাদের আর দেখা যায়নি। এখন ছায়ামূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে আছে। আসেননি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে জনপদের মানুষ সেই জনপ্রতিনিধিও দেখতে আসেন সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর।

দীর্ঘ সময় পর নিঃশব্দে আলোচনা, মাস্টারমশাইয়ের, মন্দিরের পূজারির শেষকৃত্য কীভাবে হবে। মাস্টারমশাইয়ের মেয়েকে এর মধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে। জানা গেল, রাতের মধ্যেই তারা বাড়ি এসে পৌঁছুবে। দু'একজন বয়স্ক মহিলা মনোরমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কারা যেন কিছু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে মাস্টারমশাইয়ের মরদেহের ওপর। এক পুলিশ কর্মকর্তা এসে বললেন, তারা আছেন, আর ভয়ের কিছু নেই।

আবছা আলোর মধ্যেই সবাই পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকালো, কেউ জবাব দিল না। জবাব হতে পারতো, লুট করার মতো আর কিছুই তো অবশিষ্ট নেই। দাশপাড়া কয়েক ঘণ্টায় সব হারিয়েছে। এখান থেকে থানা মিনিট চল্লিশের পথ, পুলিশ এলো সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এখন আমাদের পাহাড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু কেউ কিছু বললেন না। নীরবতার মধ্যে যে জবাব আছে, পুলিশের তা বোঝার ক্ষমতা আছে মনে হয় না।

দাশপাড়ায় রাত গভীর হচ্ছে, অনেক বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। নিস্তব্ধতাই যেন যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। হামলার সময় অনেক বাড়িতেই পুরুষরা ছিলেন

না, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন। যখন ছুটে এলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কে কাকে সান্ত্বনা দেবেন?

প্রায় মাঝরাতের দিকে এলো লাবণ্য স্বামীকে নিয়ে। না কোনো কান্না নয়, বাবার মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন চুপ হয়ে গেল। কাঁদতে ভুলে গেছে লাবণ্য। এক বয়স্ক মহিলা লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, তুই কাঁদ লাবণ্য, একটু কাঁদ। চিৎকার করে কেঁদে হালকা হ'। আমরা সবাই কেঁদেছি, আর জল নেই চোখে। এবার তুই কাঁদ মা।

কিন্তু না, লাবণ্য কাঁদলো না। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর ছুটে গেল মা'র কাছে। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই নীরবতা। নীরবতাও কখনো কখনো অসহ্য হয়ে যায়। অন্ধকার যেন সেই নীরবতাকে আরও গাঢ় করে তুলেছে। যে মাস্টারমশাই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, দেশত্যাগের বিরুদ্ধে শক্ত দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই মানুষটাই নরপশুদের শিকার হলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, কেন দেশ ছাড়বি, এ মাটি আমাদের পিতৃপুরুষের মাটি। অধিকার আমরা ছাড়বো না। সেই কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। যে মানুষটিকে সামনে রেখে গোটা দাশপাড়ার মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন, সন্ধ্যা নামলে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সবাই জড়ো হয়ে কীর্তন কিংবা মাধব ব্রহ্মচারীর সুললিত ধর্মীয় আলোচনা শুনে ঘুমোতে যেতেন সেই দিন যে শেষ হয়ে গেল !

পরের দিন যখন সূর্য উঠলো মাস্টারমশাইয়ের চিতা তখন প্রায় নিভে এসেছে। গোটা দাশপাড়ার মানুষ শ্মশানে জড়ো হয়েছেন। চিতার আগুনের দিকে সবাই তাকিয়ে আছেন, এরকম নীরবতার মধ্যে দাহ চোখে পড়ে না। অন্যদিকে মাধব ব্রহ্মচারীকে মন্দিরের পাশেই সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছেও ছিল তাই, তিনি প্রায়ই বলতেন, মৃত্যুর পর যেন মন্দিরের পাশেই তাঁর সমাধি হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছাকে দাশপাড়ার মানুষ সম্মান জানিয়েছে। এ সময় সেখানেও অনেকে ছিলেন। সমাহিত করতে বেশি সময় লাগেনি। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সমাধি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। মৃতুর পর কীর্তন হয়, কিন্তু মাস্টারমশাই বা মাধব ব্রহ্মচারীর শেষকৃত্যে কীর্তনের আয়োজন করার সাহস হয়নি দাশপাড়ার মানুষের। নীরবে-নিভৃতে শেষযাত্রা সম্পন্ন হলো। শেখ হাসিনা নিয়ম করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনাবসানের পর রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানানো হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা জানকীপ্রসাদ সেই সম্মাননা পাননি। প্রশাসনের কেউ আসেনি।

একটা দিন একটা রাত দাশপাড়াকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। মজহবির প্রচণ্ড সুনামি এসে যেন এই জনপদকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আগুনে পুড়ে দাশপাড়ার বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণ নেই। মানুষগুলো যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছেন। কোনো মা ও মেয়ে নরপশুদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। বয়স নরপশুদের কাছে বিবেচ্য নয়, নারীশরীর পেলেই হয়। এভাবেই ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে তারা। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে কোনো সরকারই এই মজহবি নরপশুদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে নারাজ। কারণ এতে মুসলমানদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় থাকে। ইসলাম যেখানে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের দল, জাতীয়তাবাদী দল, ইসলামপন্থী দল, বামপন্থী দল সব রাজনৈতিক দলই এক সুরে বাঁধা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ঘটনার দুদিন পর মাস্টারমশাইয়ের মোবাইল পরীক্ষা করে পুলিশ বলেছে, কোনো ইসলামবিরোধী বার্তার কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। গত দু'দশক ধরে এ ধরনের ইসলাম অবমাননার নাম করে যেসব ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ও গোটা হিন্দু পাড়া কিংবা হিন্দুপ্রধান গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এ ধরনের ইসলাম বিরোধী বার্তা নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, হিন্দু সমাজের কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে নিশানা করে এই ধরনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তিনি জানতেই পারেননি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ষড়যন্ত্রকারীরা সুকৌশলে ব্যবহার করে গল্পটা সাজিয়েছে। কয়েকবছর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসিরনগরে জেলেপাড়ার এক ছেলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, ইসলাম ও নবিকে অবমাননা করে ফেসবুকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাকে প্রচণ্ড গণপিটুনির পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক রাতের মধ্যে গোটা জেলেপল্লীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। গণহারে ধর্ষণের শিকার হন মহিলারা। পরে প্রমাণিত হলো, এই ছেলে তেমন শিক্ষিত নয়, ফেসবুকও চালাতে জানে না। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (র‍্যাব) পরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছেলে নয়, জাহাঙ্গির নামে এক কম্পিউটার দোকানের মালিক এই বার্তাটি ছড়িয়েছে। সেই জেলে পরিবারের ছেলেটি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও এখনো মামলা থেকে রেহাই মেলেনি। প্রতি মাসেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে আদালতে দাঁড়াতে হচ্ছে। আইনের হাত কত লম্বা হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সর্বশেষ জানা গেছে, ওই জেলেপল্লীর অনেকেই এই ঘটনার পর জায়গাজমি মুসলমানদের কাছে জলের দরে বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছেন। গত দুই দশকে ইসলাম অবমাননার অজুহাতে হামলা এবং গোটা হিন্দুপল্লী বা পাড়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও মহিলাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কয়েকশো ঘটনা ঘটেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, সাজা পায়নি।

উদ্দেশ্য সবখানেই এক ও অভিন্ন,

ঘটনার পর হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, তারা এলাকা ছাড়ে অথবা দেশত্যাগ করে। জায়গাজমি দখল বা নামমাত্র মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

দাশপাড়ার জমি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠছে, রামগঞ্জ পৌরসভার দিকে এগুচ্ছে। সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। অদূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রিসোর্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজধানীর বড় কিছু ব্যবসায়ী। জেলা সদরের সঙ্গে এই জনপদের দূরত্ব কমে আসছে। কলকারখানা হচ্ছে, শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় গত কয়েক বছরে জায়গাজমির দাম বেড়েছে।

মাস্টারমশাই কয়েকবারই বলেছেন, তোরা সতর্ক থাকিস, জমির দাম বাড়ছে। অনেকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধার সতর্কবাণী ও আশঙ্কা সত্যি হলো। এই জনপদের অভিভাবক হয়ে যিনি সবসময় বরাভয় দিতেন, তাঁকেই নিশানা করে হত্যা করা হলো। আর গোটা দাশপাড়া ও রামগঞ্জে হামলা করে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি করা হলো, যাতে এই জনপদ হিন্দু শূন্য হয়ে পড়ে। তিনি বটগাছের মতো ছিলেন, সবাইকে ছায়ার মধ্যে রেখেছিলেন। সেই বটগাছ ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

****

নিখিলেশ দোকান থেকে ফেরার পথে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গেলেন। উঠোনে এখনো রক্তের দাগ। সেখানে একটি তেলের প্রদীপ জ্বলছে, কিছু ফুল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। শুধু এ বাড়িতে নয়, দাশপাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্রদীপ জ্বলছে, বিপদনাশিনীর উদ্দেশে এভাবে প্রদীপ জ্বালানো হয়। এ জনপদের মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, বিপদনাশিনী দেবী অপশক্তির হাত থেকে সন্তানদের রক্ষা করেন। তাঁর উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালালে অন্ধকার দূর হয়, বিপদ কেটে যায়।

নিখিলেশ উঠোনে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। মাস্টারমশাইয়ের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে। সদা হাস্যময় মানুষটি নেই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যে কোনো বিপদে মানুষ তাঁর কাছেই ছুটে আসতো পরামর্শের জন্য। এখন কার কাছে যাবে?

কাকাবাবু উঠে আসুন, লাবণ্যর ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। লাবণ্য ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিখিলেশ তার পিছু পিছু ঘরে ঢোকেন, কেমন আছো মা তোমরা?

কিছু বলতে হয় বলে প্রশ্ন করা। এ সময় কারও কাছ থেকে জবাব মিলবে না তিনি জানেন। লাবণ্যও জবাব দিল না। নিখিলেশ বৈঠকখানায় এসে বসলেন। এই কক্ষকে মাস্টারমশাই ড্রয়িং রুম বলতেন না, বলতেন বৈঠকখানা। দাশপাড়ার মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বিশিষ্ট জনেরা এসে এখানেই বসতেন। এই বৈঠকখানা সবসময় জমজমাট থাকতো। এখন শূন্য ঘর, না একেবারে শূন্য নয়। লাবণ্যর স্বামী অচিন্ত্য বসে পত্রিকা পড়ছে। নিখিলেশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। নিখিলেশ বসলেন, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে পাশের ঘরে মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী শুয়ে আছেন। লাবণ্য সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো, মা কোনো কথা বলছে না। খাওয়াদাওয়া নেই। কী যে করি!

সময় লাগবে স্বাভাবিক হতে। চোখের সামনে এরকম নৃশংস ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করেননি, নিখিলেশ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাবিত্রী ও তার মায়ের কথা মনে পড়ায় তার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়। দাশপাড়ার ঘরে ঘরে কান্না, থামাবে কে? কে কাকে সান্ত্বনা দেবে?

মনোরমার স্বামী আর্ত চিৎকার করছিলেন, কিন্তু নরপশুরা আরও উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ওদের হিংস্রতার সামনে কারও কিছু করার ছিল না। কিছু পুলিশকে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তারা বর্বরতা থামানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। এক পর্যায়ে তাদের আর দেখাই যায়নি। নিখিলেশ সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি, পরে শুনেছেন। তিনি দোকানে ছিলেন। মিছিল সংগঠিত হয়েছে রামগঞ্জে, তারা দ্রুত দাশপাড়ার দিকে এগিয়ে আসবে ভাবতে পারেননি। যখন শুনতে পান, প্রায় ছুটতে ছুটতে আসেন। ততক্ষণে মাস্টারমশাই ও মাধব ব্রহ্মচারীকে হত্যা করে ইসলামের জয়যাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিজের বাড়িতে ঢুকে ইসলামি সেনাদের মুখোমুখি হন। সাবিত্রী ও তার মা'র সর্বনাশ করে তারা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেরোবার সময় পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়িতে। কিছুক্ষণের জন্য হতবিহ্বল হয়ে যান নিখিলেশ, তারপরই টেনে হিঁচড়ে বের করে আনেন অর্ধনগ্ন মা-মেয়েকে। সাবিত্রীর তখনো জ্ঞান ফেরেনি। সে দৃশ্য তিনি ভুলে যেতে চান, কিন্তু পারছেন না। রাতে ঘুম আসে না। নিজেকেই তার অপরাধী মনে হয়। তিনি ওদের বাঁচাতে পারেননি।

লাবণ্য কিছু যেন বলছিল, কিন্তু বুঝতে পারেননি। লাবণ্য আবার বলে, কাকাবাবু কি কিছু ভাবছেন ?

দুঃস্বপ্ন থেকে ফিরে নিখিলেশ বলেন, না মা, তেমন কিছু না। বল মা, কী যেন বলছিলে।

কাকা বলছিলাম, নমো নমো করে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করলাম। অপমৃত্যুর জন্য শ্রাদ্ধের দিন কমে গেল। এখন আমাদের কি আর কিছু করণীয় আছে? আমরা তো কিছু জানি না। ঢাকায় আমি ও আপনাদের জামাই দুজনেই চাকরি ফেলে এসেছি। মা এই অবস্থায়, কী করবো বুঝতে পারছি না।

আমি কী পরামর্শ দেবো মা, আমি নিজেই তো অসহায় হয়ে পড়েছি। বাড়ি ফিরতেই ভয় পাই। এতোদিন পরামর্শের জন্যে যার কাছে ছুটে আসতাম, তিনিই

তো নেই। প্রত্যেক ঘরেই এখন কান্না। কী হবে আমাদের বুঝতে পারছি না। আজ এক ভয়ংকর কথা শুনলাম। আমাদের এমপি সাহেব নাকি বলেছেন, তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে আসবেন। আমাদেরকে তাদের সামনে বলতে হবে, এখানে সেভাবে কোনো হামলা হয়নি। কোনো কোনো সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করে খবর ছেপেছে। এ খবর বিদেশের কাগজেও ছাপা হয়েছে। সরকার চায়, পাল্টা কিছু খবর ছাপা হোক।

লাবণ্য শুনে হতবাক। অচিন্ত্য বলে, নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে। ওরা আর কী চায়? আপনারা কি সাংবাদিকদের সামনে বলবেন কিছু হয়নি ?

আমার আর কিছু হারানোর নেই। যাই ঘটুক, আমি সত্যি কথাই বলবো। জানি এমপি সাহেব খুশি হবেন না, কিন্তু আমার আর কী ক্ষতি হবে ? আমি তো সবই হারিয়েছি। ওরা কী চায় তা মাস্টারমশাই আগেই আমাদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি মাথার ওপর বটগাছের মতো ছিলেন বলে সাহস পায়নি। আজ আমাদের মাথার ওপর কোনো ছায়া নেই। কিন্তু মাথা নীচু করে থাকলে বাঁচা যাবে না। আমি অন্তত দাঁড়াবো।

লাবণ্য বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এটাই আশা করেছিলাম কাকাবাবু। আপনাদের মধ্যে বাবা বেঁচে থাকলে আমি সবচেয়ে বেশি গর্ব অনুভব করবো। তবে আপনি একা নন, দাশপাড়ার সব মানুষ যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলেই বাঁচবেন, নয়তো কেউ রেহাই পাবেন না।

কিন্তু এ কাজটি করবে কে? দাশপাড়ায় স্বাভাবিক জীবন এখনো শুরু হয়নি। নিখিলেশের নিজের বাড়িতেও নয়। রাধারানি যন্ত্রচালিতের মতো কোনোরকমে খাবারটুকু তৈরি করেন, নিজে মুখে তোলেন কিনা চোখে পড়েনি। তবে মেয়েকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। নিখিলেশ নিজেও খেতে বসেন বটে, কিন্তু নিয়ম রক্ষার জন্য। মনে করেন, তিনি খেতে না বসলে রাধারানি আরও ভেঙে পড়বে। বাড়ির অনেক সামগ্রী পুড়ে গেছে, তার মধ্যেই সময় গড়াচ্ছে। কখনো স্বামীকে বলেন না, অমুক এনো, তমুক এনো। ঘরে ঠাকুরের আসন পুড়ে গেছে, লক্ষ্মী ও গোপালের মূর্তি কালো হয়ে গেছে। ইতস্তত পড়ে আছে পূজার নানা সামগ্রী। নিখিলেশ বলেছে কয়েকবারই, ঠাকুরের আসনটা গুছিয়ে নাও। কিন্তু না, রাধারানি যেন শুনেও শোনেননি। ঠাকুরের প্রতি অভিমান ? হয়তো-বা বুঝতে পারেন না নিখিলেশ। তবে উঠোনে বিপদনাশিনীর উদ্দেশে প্রদীপ জ্বলছে ঠিকই। পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গেছেন নিখিলেশ, একই চিত্র।

বাড়ি ফিরতে ভয় নিখিলেশের, রাধারানি ও সাবিত্রীর মুখ দেখলেই হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে যায়। মাস্টারমশাইয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে লাবণ্যকে বলেন, তোমরা মাকে এভাবে ফেলে যেও না। আমার মনে হয়, তোমাদের সঙ্গে ঢাকা নিয়ে যাও। সময় সবকিছু স্বাভাবিক করে দেবে।

নিখিলেশ পথে নেমে হরেন দাশ ও রঘুরামের বাড়িতে ঢুকলেন। দুজনেই আহত হয়েছেন পরিবারের মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে। মেয়েরা নরপশুদের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। দুই পরিবারেই রাধারানি ও সাবিত্রীদের দেখলেন আরেকবার। তাদের নতুন করে কিছু বলতে পারলেন না। আরও কয়েকটি বাড়ি গেলেন। নলিনীর ঠাকুমার বয়স সত্তরের ওপরে। তাঁকেও ছাড়েনি নরপশুরা। তিনি মাটির বারান্দায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। নিখিলেশ দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন, ঠাকুমার সামনে পড়তে চান না। নলিনীর ঠাকুমা কাঁদেন না, নীরবে তাকিয়ে থাকেন, চোখ দিয়ে জল পড়ে। এ দৃশ্য সবচেয়ে মর্মান্তিক।

বাড়ি যেতে যেতে মনে পড়লো, তিনি তো লাবণ্যকে বলে এলেন, সময় সবকিছু স্বাভাবিক করে দেবে। কথাটা শুনতে ভালো, এছাড়া বলবেনই-বা কী?

বিকেল নেমেছে। এসময় বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে খেলায় মেতে ওঠে। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু কী নেই দাশপাড়ায়। কোনো কোনো বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম, গানের সুর ভেসে আসে। কিন্তু সেই হামলার পর বাচ্চারাও যেন খেলতে ভুলে গেছে। গান আসে না। অনেককেই দেখলেন হয় বাড়ির বারান্দায়, কিংবা পুকুরঘাটে চুপচাপ বসে আছে। তারা কি কথা বলতেও ভুলে গেছে ? সেদিনের পর থেকে কেউ স্কুলে যায় না। বাচ্চারাও হয়তো ভাবছে, এসময় খেলাধুলা করতে নেই। গান করতে নেই। বড় গলায় কথাও বলতে নেই।

সন্ধ্যায় শাঁখ বাজে না। কাসর-ঘণ্টা বাজে না। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে না। দুপুরে মহিলারা কয়েকটি বাড়িতে একত্র হয়ে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করেন, গানের সুরে পাঠ হয়। এটা দাশপাড়ার প্রাণ। সেদিনের পর পাঠ দূরে থাক, মহিলারা ঘর থেকে বেরোন না। মন্দিরে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। কবে শুরু হবে কেউ জানে না। এ বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবছেন বলেও মনে হয় না। সামনে অনেক অনুষ্ঠান। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী তারপরই দুর্গাপূজা। দিন এগিয়ে আসছে। কী হবে মাথায় আসছে না। ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ বাড়ি ঢুকলেন। রাধারানি শুয়ে আছেন। সাবিত্রী জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু অপেক্ষা করলেন, এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে, ডাকলেন, মা, কাছে আয় মা।

সাবিত্রী ফিরে তাকালো। রাধারানি উঠে বসলেন। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। সাবিত্রী হঠাৎ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার বুকে— বাপি, আমি আর পারছি না। কী করবো বলে দাও। বলে দাও আমায়। আমরা কি দেশ ছেড়ে যাবো?

কয়েকদিন নিস্তব্ধতার পর নদীতে যেন জোয়ার এলো। বাঁধভাঙা কান্না। রাধারানি

এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, কান্না ভুলে গিয়েছিল মেয়েটা। কাঁদুক, কাঁদতে দাও। আমি তো কাঁদতেও ভুলে গেছি। ও কাঁদুক।

দাশপাড়ার মেয়েরা, মায়েরা এভাবে কেঁদে একটু হালকা হোক। বাবারাও কাঁদুক। নিখিলেশ মেয়ের কান্নার জলে ভেসে যাওয়া বুকে নতুন করে জীবনকে পাওয়ার চেষ্টা করলেন।

****

আমরা কি দেশ ছেড়ে যাবো ?

মেয়ে কথা বলেছে,বাবা-মা দুজনেরই আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু সে কী বলতে চাইছে? এ কথার মানে কী? নিখিলেশ একটা আশঙ্কার কথা ভেবে শিউরে উঠলেন। রাধারানিকে এখনই কিছু বললেন না। শুধু বললেন, প্রায় এক সপ্তাহ পর মেয়ে কথা বলছে। এটাই বড় কথা। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুরের আসনটা এবার গুছিয়ে নাও।

রাধারানি কোনো জবাব দিলেন না। রান্নাঘরে গিয়ে বাসনপত্র নিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেলেন। নিখিলেশ বুঝতে পারলেন, যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা সহজে নিরাময় হবে না। অতুলদাও সেকথা বলছিলেন। তার ছেলে বাপ্পা মাকে ধর্ষণের বীভৎস দৃশ্য দেখেছে। এসময় ঘরে আলমারির পেছনে লুকিয়ে পড়ে ভয়ে কাঁপছিল। এক সময় অজ্ঞান হয়ে যায়। এর পর এখনো সে কথা বলেনি। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে। একমাত্র ছেলে অতুলের। ছেলেটা কাঁদে না, বাপ্পার মা কাঁদে না, শুধু নীরবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অতুল কাঁদে। সারাদিন ঘরের বারান্দা কিংবা পুকুরঘাটে গিয়ে বসে থাকে। এ অবস্থা প্রায় প্রতিটি বাড়িতে।

পাহাড়ের কোলে এই গ্রামটিতে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। ছোট্ট জনপদ, কিন্তু গোটা পাঁচেক পুকুর, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী, মূলত এটি একটি খাল, বর্ষায় পাহাড়ি ঢলে স্ফীত হয়ে নদীর আকার ধারণ করে। গ্রীষ্মে হাঁটু জল। গ্রামটিকে অপরূপ করে সাজিয়েছে। সবুজের সমারোহ গ্রামটিকে ঘিরে। প্রতিটি সন্ধ্যা নামে মন্দিরে আরতির মুখর ধ্বনিতে। গোটা দাশপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে কীর্তনের সুর। সেই শব্দে মিশে যায় শাঁখ ও কাসর-ঘণ্টার শব্দ। স্কুল থেকে ফিরে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলায় মেতে ওঠে। সন্ধ্যায় পড়তে বসে। এটাই দাশপাড়ার জীবনের ছন্দ। সেই দাশপাড়ায় এখন দিনের আলো আতঙ্কের, রাত নামে নিঃশব্দে আরও ভীতি ছড়িয়ে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারকে এখন ভয় পেতে শিখেছে দাশপাড়া। কোথায় কে ওত পেতে বসে আছে ! শুনশান নীরবতা রাত-দিনকে এক করে দিয়েছে। অগুনতি পাখপাখালির রাজ্য এই জনপদ, কিন্তু এখন পাখিরাও যেন সতর্ক হয়ে ডাকে।

তাই-ই মনে হয় অভিজিতের। এক-আধটু কবিতা পড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু বোন প্রিয়াঙ্কা সব কেড়ে নিয়ে গেছে। একমাত্র বোন, অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে নরপশুরা। ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, আত্মঘাতী হয়। বাবা নেই, মা আছেন। একা থাকেন, তবে প্রতিবেশীরা একাকিত্ব অনুভবের সুযোগ দেয় না। এটা দাশপাড়ার রীতি, সবাই মিলে এক পরিবার। বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকদিনের ছুটি থাকায় মাকে দেখতে বাড়ি এসেছিল। আসা-যাওয়ায় কখনো একা ছাড়ে না বোনকে, অভিজিৎকেও আসতে হয়। মায়ের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি নরপশুরা। মেয়ের ধর্ষণে বাধা দিতে গিয়েছিল মা। ঘটনার দিন অভিজিৎ রামগঞ্জে গিয়েছিল, পরের দিন ঢাকা ফেরার বাসের টিকিট কাটতে। সেখানে কয়েকজন বাল্যবন্ধুর দেখা, এক রেস্তোরাঁয় আড্ডায় মেতে উঠেছিল। সেখানে বসেই জেহাদিদের মিছিলের খবর পেয়েছিল। কিন্তু সেটা যে দাশপাড়ার দিকে ছুটে যাবে, মাস্টারমশাইকে নিশানা করবে কল্পনাও করতে পারেনি। যখন ছুটে আসে সব শেষ হয়ে গেছে।

সকালে দেখা হয়েছিল নিখিলেশের সঙ্গে। সন্ধ্যার পর অভিজিৎ নিখিলেশের বাড়িতে আসে। তার আগে দাশপাড়ার শ্মশানে গিয়েছে। দাশপাড়ার সর্বজনীন শ্মশান, পূর্বপুরুষরা শুয়ে আছেন এখানে। সদ্য যুক্ত হয়েছেন মাস্টারমশাই, প্রিয়াঙ্কা। শ্মশানের পশ্চিম প্রান্তে একটা কালী মন্দির রয়েছে, শ্মশানকালী নামে তিনি পূজিতা হন। অমাবস্যার রাতে এখানে অনেকে এসে প্রয়াতদের স্মরণে বাতি জ্বালান। দুর্গাপূজার পর বার্ষিক কালীপূজায় সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। গোটা উপজেলা, জেলার হিন্দুরা এখানে ছুটে আসেন। গোটা সপ্তাহজুড়ে রাতে কীর্তন হয়। অভিজিৎ বোনের চিতার কাছে দাঁড়ায়, পাশেই বাবা শুয়ে আছেন। প্রিয়াঙ্কার বছর দশেক যখন বয়েস, তখন বাবা মারা যায়। শেষ শয্যায় শুয়ে তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, বোন যতদূর পড়তে চায় তুই নিয়ে যাবি।

সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে অভিজিৎ। মেধাবী বোন, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে এ-প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই বোনের পথচলা এভাবে থেমে যাবে ভাবতে পারেনি অভিজিৎ। বোনের উদ্দেশে বলে, যেখানে থাকিস তুই ভালো থাকিস। আমরা তোকে রক্ষা করতে পারলাম না। এ লজ্জা শুধু আমার একার নয়, আমাদের সবার।

অদূরে মাস্টারমশাই। সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায় অভিজিৎ। বলে, আমরা অসহায় হয়ে গেলাম মাস্টারমশাই। জানি না আগামীদিনে আমরা কী করবো! আপনার হাতটা আমাদের ওপরে থাকুক।

অভিজিৎ ঢাকায় থাকে, যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায় কাজ করে তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি হামলার

পর দাশপাড়া এসেছিলেন। তারা দাশপাড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করেছেন, তাদের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এছাড়া কয়েকটি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলও যথাযথভাবে হামলার চিত্র তুলে ধরেছে। সরকারের অস্বস্তির কারণ তাই-ই। এমপি সাহেব সে কারণেই উঠে-পড়ে লেগেছেন। তবে অভিজিতের অজানা নেই, দাশপাড়ার জমির প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি আছে, এমপি সাহেব তাদের অন্যতম। এ কথা মানবাধিকার প্রতিনিধিদের জানিয়েছে অভিজিৎ।

শ্মশান কালী মন্দিরের বারান্দায় বসে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে অভিজিৎ। সন্ধ্যা নামছে, একটু পরেই পূজারি আসবেন। আরতি হবে। সঙ্গে একজন কর্মী আছেন, এই দুজন কালীমন্দিরের কাজ করেন। এই শ্মশান মাস্টারমশাই দেখভাল করতেন, এখন কী হবে কে জানে?

নিখিলেশ বারান্দায় বসেছিলেন, অভিজিৎকে দেখে বলেন, বসো।

কাকাবাবু, চলে এলাম। কী হবে বলুন তো। আমরা কী করবো? দাশপাড়ার মানুষ উঠে দাঁড়ায়নি এখনো। জীবনযাত্রা তো শুরু করতে হবে। আমার অফিসের সহকর্মীরা বলেছেন এই ঘটনায় মামলা হয়নি এখনো। সরকার যুক্তি দেখাচ্ছে, মামলা হোক, পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু মামলা করবে কে? সাহস করে কেউ কি সামনে আসবে?

অভিজিৎ বিস্তারিত জানালো নিখিলেশকে। সাংবাদিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। জবাবে তিনি বলেন, মামলা হয়নি। মামলা হোক। সাংবাদিকরা বলেন, কেন পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করতে পারে। জবাব মিলেছে, আইন অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম অবমাননায় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। মানুষের ক্ষোভটাও দেখতে হবে। সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন ছিল, মাস্টারমশাই জানকীপ্রসাদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে ইসলামের অবমাননা হয় সে রকমের বার্তা দেওয়ার কোনো প্রমাণ পায়নি পুলিশ। তাছাড়া জানকীবাবু ফেসবুক ব্যবহার করেন না সে প্রমাণও মিলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব, তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। সাংবাদিকরা বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। এক্ষত্রে আপনি অন্য কথা বলছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথার জবাব দেননি। সাংবাদিকরা জানতে চায়, মিছিল শুরু হওয়ার পর যখন দাশপাড়ার দিকে এগুতে শুরু করে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কেন? জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'পুলিশ ছিল, ওরা চেষ্টা করেছে' এটুকু বলে উঠে যান।

অভিজিৎ আরও বলে, সরকারের ভূমিকা এতেই স্পষ্ট হয়, সরকারের নেতারা স্বাধীনতাবিরোধী উগ্রপন্থীদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা কী করবো। আমরা যদি চুপচাপ থাকি, তাহলে এ মাটি থেকে উৎখাত হয়ে যেতে হবে। আমাদের জায়গাজমির দিকে এবার ওরা তাকাবে কাকাবাবু। এখন তো মাস্টারমশাই নেই। আপনি সবাইকে ডাকুন, কথা বলুন। এক নাগারে অনেকক্ষণ কথা বলে অভিজিৎ নিখিলেশের মুখের দিকে তাকালো।

নিখিলেশ এতো কিছু জানতেন না। পত্রিকা সবদিন পড়াও হয় না। অভিজিতের মুখে সব শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, সবাইকে ডেকে এ নিয়ে আলোচনা করলেই ভালো। আমার মনে হয়, অত্যন্ত দ্রুত আমাদের বসা উচিত। কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আগে আমরা রাধাগোবিন্দ মন্দির কিংবা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বসতাম। এখন আমরা কোথায় বসতে পারি বলতো? আমার তো মনে হয় দেরি করা উচিত হবে না।

অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কেন, এখানে আপনার বাড়িতে তো আমরা বসতে পারি। এবং আজই।

কীভাবে আজই সম্ভব ?

অভিজিৎ বলে, কাকাবাবু আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাবো না, কিন্তু আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। আপনি যদি বলেন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সবাইকে খবর দিচ্ছি। অনেকে হয়তো আসবে না। তবুও যারা আসবেন তাদের সঙ্গে কথা বলুন।

নিখিলেশ বুঝতে পারলেন, অভিজিৎ যা বলছে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। তিনি শুধু বললেন, আমরা ভেতরেই বসবো অভিজিৎ। বারান্দায় খোলা জায়গায় বসা ঠিক হবে না। তুমি যাও।

রাধারানি ও সাবিত্রী শুয়েছিলেন। ঘরে অন্ধকার, নিখিলেশ আলো জ্বালালেন। রাধারানি তাকালেন, কিছু বললেন না। নিখিলেশই বললেন, পরিস্থিতি তো খুবই খারাপ, পাড়ার অনেকে আসবে। একটু আলোচনা হওয়া দরকার। অভিজিৎ বললো, এখানেই বসবে।

রাধারানি শুধু বললো, তোমরা এঘরেই বসো। আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি। সাবিত্রী ওঠো মা। মেয়েকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন রাধারানি। অস্বস্তি কাটছে না কিছুতেই। মা-মেয়ের জীবনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা কি কোনোদিনই নিরাময় হবে না? এ সংসার কি আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠবে না? নিখিলেশ নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকজন এসে এলেন। দেখা হলে যেভাবে সবার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা হয়, তা অনুপস্থিত। যেন আসতে হচ্ছে বলে আসা। পাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ হরেনকাকা। তাঁর নাতনি নবম শ্রেণীর ছাত্রী মিতালী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিতে হয়েছে, দু'দিন আগে বাড়ি ফিরেছে। হরেনকাকা এসেই



বললেন, নিখিলেশ তুমি সবাইকে ডেকেছ, অত্যন্ত দরকার ছিল। জানো তো মিতালী এখনো সুস্থ হয়নি। তবু আমি এসেছি, ছেলে আসতে চায় না। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম কিছু একটা করা দরকার। এভাবে বসে থাকা যায় না।

নিখিলেশ হরেনকাকাকে হাত ধরে বসালেন। একে একে এলেন নিতাইচাঁদ, অতুল, জ্ঞানেশকাকা, সুরঞ্জিত, তাপস মণ্ডল, অবিনাশ, মোহিনীকাকা। অভিজিৎ বলল, নিশ্চয়ই আরও কেউ কেউ আসবেন। আমি সবাইকে বলেছি। কাকাবাবু আপনি শুরু করুন, আমরা খুব ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছি।

ঘরে দুঃসহ নীরবতা। কথা বলতে যেন ভয় হচ্ছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে বিকেলে, এখনো আসেনি। টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বলছে, অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করছে। মাঝে মাঝে কেঁপে যাচ্ছে আলোকশিখা। এর মধ্যেই নিখিলেশের অনুরোধে অভিজিৎ সবকিছু বিস্তারিত তুলে ধরে। পরিশেষে বলে, আপনারা শুনলেন সবকিছু। জায়গাজমির ওপর থাবা হয়তো এখনই আসবে না। এটা সময় নেবে। যতদূর মনে হয়, এই মোল্লাদের যারা মাঠে নামিয়েছে তারা চাইবে আমরা এই ভয়ংকর হামলার পর দেশত্যাগ করি। এভাবেই সারাদেশে কৌশলে হিন্দুদের দেশছাড়া করা হয়।

সবই বুঝলাম, কিন্তু হামলাকারীদের

বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কি নেওয়া হবে না? সবার আগে হরেনকাকাই কথা বললেন।

নিখিলেশ বলেন, অভিজিৎ তো বলেছে, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করবে না। এখন আমরা কী করবো তা নিয়েই আজ আমাদের বসা। হামলাকারীদের অনেকে আমাদের চেনা। আমাদের চারপাশের লোক। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তো ওইদিন হামলাকারীদের দেখেছে। তাহলে ব্যবস্থা নিতে এতো দ্বিধা কেন ? বলছে, মামলা না হলে তারা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না।

পাড়ার আরও কয়েকজন এসে গেছেন— দেবেশ, শ্রীনাথ ও হৃষীকেশ। তারাও শুনেছেন নিখিলেশের কথা। সবাই চুপচাপ, এর পর কী কথা হতে পারে তা যেন কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। একটা গুঞ্জন, কিছু নীরবতা, সব ছাপিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

এবার নীরবতা ভেঙে কথা বললেন জ্ঞানেশকাকা, এখন আমাদের প্রধান কাজ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আরও সহজ কথায় বলি, আমরা কোনোভাবে দেশ ছাড়বো না। পিতৃপুরুষের বাস। এ মাটি আমরা ছাড়বো না। যাবো কেন?

ঘরে নতুন হাওয়া। আরও কয়েকজন কথা বললেন একই ভাষায়। সেদিনের হামলার পর ভাষা হারিয়ে গিয়েছিল। শুধু কান্নাই ছিল ভাষা। আজ সে কান্না কি প্রতিবাদে রূপ নিচ্ছে?

নিখিলেশই কথাটা তুললেন, দেশ ছাড়বো না, সে তো আমাদের সবারই মনের কথা, মাস্টারমশাই আমাদের সাহসী করেছেন। তিনি নেই, ঘাতকদের, হামলা-ধর্ষণ যারা করেছে সেইসব নরপশুদের কি আমরা ছেড়ে দেব? আমরা কি এমপি সাহেবের সামনে বলবো, সেরকম কিছু এখানে হয়নি?

আবার নীরবতা। বাইরে অন্ধকার, মোমবাতি ছোট হয়ে এসেছে, আর কিছু সময়। এখনো বিদ্যুৎ এলো না। নতুন করে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিখিলেশকে বলে, কাকাবাবু আরেকটা মোমবাতি লাগবে, এটা তো একটু পরেই নিভবে।

নিখিলেশ মোমবাতি খুঁজতে গেলেন। সবাই নীরব। তাহলে আজ বসার ফল কী দাঁড়াল! সিদ্ধান্ত তো কিছুই হলো না। দাশপাড়া কীভাবে এগুবে! নিখিলেশ নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। পুরনোটা নিভিয়ে দিলেন না। জ্বলুক না, ক্ষতি কী? ঘরে আলো একটু বাড়লো। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে গাঢ় অন্ধকার।

মোহিনীকাকা এতক্ষণ কথা বলেননি। তাঁর ছেলে নেই, ঘরে বিধবা বৌমা ও বছর দশেকের নাতি। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। বৌমা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ছেলের মৃত্যুর পর মোহিনীবাবু সংসার আগলে রেখেছেন, কিছু জায়গাজমি আছে। তিনি কথা বললেন প্রচণ্ড ক্ষোভে, আমরা কি কিছুই করবো না?

নীরবতা গাঢ় হলো, কেউ কোনো জবাব দিলেন না। রাত বাড়ছে, কিন্তু কেউ উঠছেন না। যেন এক নিঃস্তব্ধতা গ্রাস করেছে । হঠাৎ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো সাবিত্রী— বাপি, আমি ভয় করি না। আমার নামে মামলা হবে। কী হবে আর ভয় পেয়ে ? তুমি ব্যবস্থা করো বাপি। কালই, আর দেরি নয়। আর এমপি সাহেব এলে আমিই বলবো, সেদিনের হামলার সবচেয়ে বড় সাক্ষী আমরা, মেয়েরা।

নিখিলেশ উঠে দাঁড়ালেন, এ কোন সাবিত্রী, তাঁর মেয়ে তো! দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি তাকে তো চিনতে পারছেন না। প্রচণ্ড হাসি-খুশি, প্রায় সারাদিনই হইচই করে বেড়ানো সাবিত্রী এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ দাশপাড়ার মানুষের বৈঠকে স্তব্ধতা রুখে দিয়ে যেন এক তপস্বিনী ধ্যান ভেঙে বলে উঠলো— চরৈবেতি, চরৈবেতি। এ এক অপূর্ব জাগরণ।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। সবার আগে জ্ঞানেশবাবু এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রীর হাত ধরলেন, তুই আমাদের মাঝে আয় মা। আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলি। সবার মাঝে আয়।

নিখিলেশ বোবা। রাধারানির বিস্ময় কাটেনি। এই সাবিত্রী তাদের মেয়ে! ইতোমধ্যে সাবিত্রীকে সবার মাঝে নিয়ে আসা হয়েছে। মোমবাতির আলোয় ছায়ামূর্তির মধ্যে মানুষগুলো যেন সত্যি সত্যি জেগে উঠেছে, সুর মিলিয়ে বলতে চাইছে, আমরা আর ভয় পাই না। তুই এতো শক্তি কোথায় পেলি মা! দাশপাড়া সত্যি সত্যি এবার গর্জে উঠবে।

এখন নিখিলেশ কাঁদছেন, কাঁদছেন রাধারানিও। কিন্তু সাবিত্রী কাঁদছে না। দাশপাড়ায় এ রাতটা বড় বেশি আনন্দের।

